অপারেশন কাঁকনপুর

আলী ইমাম

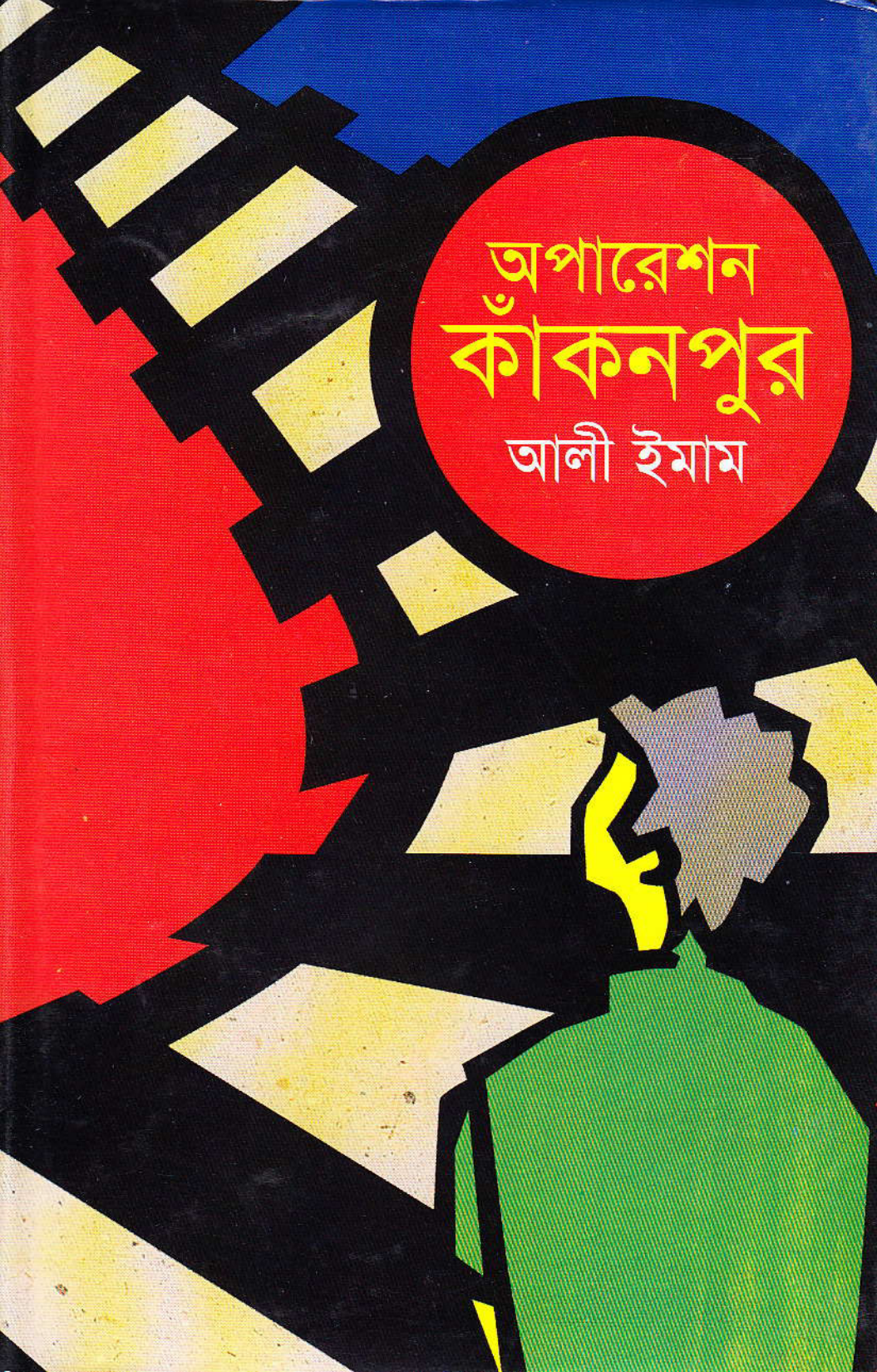

অপারেশন কাকনপুর

আলী ইমাম

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
বাস্তবায়নে : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
anannyadhaka@gmail.com

প্রকাশক ❑ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০০১
তৃতীয় মুদ্রণ ❑ ডিসেম্বর ২০১০

স্বত্ব ❑ লেখক
প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ

কম্পোজ ❑ তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ❑ পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

দাম ❑ পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN 984 70105 0381 4

Operation Kakanpur by Ali Imam
Published by : Monirul Hoque, Ananya 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
Third Edition : December 2010, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : Tk. 75.00 Only

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited**
22, Brick Lane, London

U.S.A Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd floor, Jackson Heights, N.Y 11372

Canada Distributor ❑ **Anyamela**
300 Danforth Ave., Toronto (1st floor), Suite-202

Canada Distributor ❑ **ATN Mega Store**
2970 Danforth Ave. Toronto

চাঁদের হাটের
সকল চাঁদমণি
ভাই বোনকে

পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
বাস্তবায়নে : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

কাঁকনপুর কতদূর

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল পিকুর। কামরায় মৃদু আলো। খোলা জানালা দিয়ে সাঁই সাঁই করে বাতাস আসছে। সামনের বেঞ্চিতে যে লোকটা জবুথুবু হয়ে শুয়ে ছিল, তার নাক ডাকার শব্দ পেল পিকু। সন্ধ্যেবেলায় লোকটা কি দারুণ জমিয়ে গল্প করছিল। কেমন করে ঘুড়ির সুতোতে বড়শি বেঁধে পাখি ধরা যায় তার গল্প। গেল বছর লোকটা নাকি সাঁইত্রিশটা পাখি ধরেছিল। লোকটার কাছে সবচাইতে প্রিয় নাকি শীতের দিনের শুকনো পাতা জ্বাল দিয়ে হরিয়াল পাখি ঝলসে ঝলসে খাওয়া। সেই শুকনো পাতাগুলো যদি শাল গাছের হয়, তবে তো ভারি চমৎকার। শাল পাতার কেমন একটা ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধ রয়েছে। তাতে পাখির নরোম মাংসের নাকি আলাদা একটা সোয়াদ পাওয়া যায়।

লোকটা তার কেমন ফ্যাসফ্যাসে গলায় এই সব কথা বলে পিকুকে চমকে দিচ্ছিল। "জানো খোকা, সন্ধ্যে যেই না ঝুপ করে নামলো অমনি পাখিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। কার আগে কে বাড়ি ফিরবে। ঝটপট করে উড়তে থাকে তারা। আমিও তখন সুযোগ পেয়ে যাই। আমাদের পুরনো বাড়িটার ভাঙা ছাদের এক কোণায় ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থেকে ঘুড়ি উড়িয়ে

দেই। আমার মাঞ্জা দেয়া চকচকে ঘুড়ির সূতোতে বড়শির সারি ঝোলানো থাকে। যেই না মাথায় উপর দিয়ে পাখির ঝাঁক উড়তে থাকে পতপত করে, অমনি দেই হ্যাঁচকা টান।"

ট্রেনের দুলুনির মাঝেও লক্ষ্য করছিল পিকু, এই কথাগুলো বলার সময় লোকটার চোখ দুটো কেমন যেন ঝকঝক করছিল। ঠিক সিয়ামীজ বেড়ালের মতো।

"দেই তো হ্যাঁচকা টান। যাবে কোথায় বাপু পাখিগুলো। তাদের কেউ কেউ দিব্যি গেঁথে যায় আমার উড়ন্ত বড়শিতে। অমনি টপটপ নামিয়ে আনি ওদের।"

লোকে যে রকম করে মাছ ধরার গল্প বলে, লোকটা সে রকম করে পাখি ধরার গল্প করছিল।

"একবার ধরেছিলাম বেশ কয়েকটা মুনিয়া। এক সাহেবের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলাম !"

সেই লোকটা মলিন একটা চাদর জড়িয়ে কেমন জবুথুবু হয়ে শুয়ে আছে। এখন দেখে ভাবাই যায় না, সন্ধ্যেবেলায় এমন সব গল্প বলে পিকুকে অবাক করে রাখছিল। ঘটাং ঘট ঘটাং ঘট। ট্রেনটা কি জোরেই চলেছে। বেতের বাক্সে রাখা পানির বোতলগুলো ঠকঠক করে নড়ছে। পাকা কলার কেমন মিষ্টি গন্ধ। পিকুর আব্বা ফলপাকুড় খুব পছন্দ করেন। ট্রেনে কোথাও যেতে হলে ঝুড়ি ভর্তি ফল নেবেনই। পিকুর আব্বার বদলীর চাকরি। তাদের এ-শহর থেকে ও শহরে যেতে হয়। ট্রেনজার্নি চমৎকার লাগে পিকুর কাছে। কতো ঘর-বাড়ি চোখের নিমেষেই দু'পাশ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই অল্প বয়সে আব্বার সাথে কম তো ঘোরা হলো না। মাঝরাতে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে এসব কথা এলোমেলো ভাবছিল পিকু। ট্রেনের চলার শব্দ এখন পালটে গেছে। গুম গুম করে শব্দ হচ্ছে। নিশ্চয়ই ট্রেনটা কোন ব্রীজের উপর উঠেছে। তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে তাকালো পিকু। কালো নদীর বুকে মিটমিট করে কয়েকটা আলো জ্বলছে। মাছ ধরার নৌকার আলো। কি অদ্ভুত রকমের সুন্দর লাগছে। পিকু ভাবলো, জেলেরা না ঘুমিয়ে সারারাত এমনি করে নদীর বুকে বুঝি মাছ ধরে থাকে। তাদের কালো কালো নৌকার পাটাতনে জমে থাকে রূপো রূপো মাছের গাদি।

নদীর বুক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে কলকল করে। ঘুম ভাঙার পর চোখ দু'টো যে জ্বালা করছিল এখন ওপর দিয়ে যেতে যেতে পিকুর মনে হলো, সে যেন একটা উড়ন্ত পাখি। আচ্ছা, আমি এতো ঝুঁকে আছি কেন? যদি ঝুপ করে

নদীর বুকে পড়ে যাই তবে কেউ আর আমাকে খুঁজে পাবে না। আমি যদি ঝপাৎ করে নদীর বুকে পড়ি, তবে নিশ্চয়ই মাছধরার জেলে নৌকাগুলো আমাকে দেখতে পাবে। জাল দিয়ে আমাকে টেনে তুলবে। দূর ছাই, কি সব আবোল-তাবোল ভাবছি। পিকু মুখ সরিয়ে নিল জানালা থেকে। কামরার মৃদু ছমছমে আলোতে দেখলো, চোখের সামনে একটা কালো হাত নেমে আসছে। হাতটা ওপর থেকে নামছে। বিকট ছায়া পড়েছে হাতটার। পিকু ভয়ে চীৎকার করে উঠতে যাবে, অমনি খক খক করে কেশে ওপরের বাঙ্ক থেকে একজন বুড়োমতো লোক নেমে এলেন। হাত নামিয়ে এতোক্ষণ তিনি নীচে নামার জন্য ধরার মতো কিছু একটা খুঁজছিলেন। এতোক্ষণে আশ্বস্ত হলো পিকু। উফ্, কি ভয়টাই না পাচ্ছিল। আর ভয় পাবেই না কেন বলো। মাঝরাতে ঘুম ভাঙা চোখে কেউ যদি অমন করে কোন কালো হাতকে চোখের সামনে এগিয়ে আসতে দেখে। বুড়ো লোকটা নেমে তার জিনিজসপত্র গোছাতে লাগলেন। সামনেই বুঝি কোন স্টেশন। ট্রেনের গতি আস্তে আস্তে থেমে আসছে।

বুড়ো লোকটা লম্বা একটা কোট চাপালেন গায়ে। পিকুর দিকে তাকিয়ে বললেন "কি খোকা, জায়ফল খাবে নাকি? খুবানীও আছে আমার কাছে।" বলে পকেটের ভেতর থেকে একটা সবুজ কাগজের পুঁটলি খুলে কি খেতে দিলেন পিকুকে। আর আশ্চর্য, অমনি চমৎকার মিষ্টি একটা গন্ধে কামরাটা যেন ভরে গেল। "নাও খোকা, লজ্জা কি, নাও!"

পিকু ঠিক বুঝতে পারছিল না, এমন সময় অজানা-অচেনা কোন লোকের কাছ থেকে হুট করে কোন খাবার নেয়া তার ঠিক হবে কিনা। আব্বা যদি বকে। এখন অবশ্য সে সম্ভাবনা নেই। পিকুর আব্বা চমৎকার নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন।

"ছি খোকা, নাও। বুড়ো মানুষের কথা শুনতে হয়। জানো না তো কাশ্মীরে আমার কয়েক বিঘে জাফ্রানের ক্ষেত ছিল। সব শেষ হয়ে গেছে। আগের দিন থাকলে, তোমাকে এক শিশি জাফরানই দিয়ে দিতাম। নাও, খুবানী খাও।" বলে লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল পিকুর দিকে।

কামরার মৃদু আলোতে পিকু দারুণ আতঙ্কে দেখলো, লোকটার আঙুলগুলো হাড়ের। একেবারে দুধশাদা। তাতে মাংসের কোন বালাই নেই। কঙ্কালের হাতের মতো ঠকঠক করে কাঁপছে। বিস্ফারিত হয়ে গেল পিকুর চোখ। কামরার সবাই ঘুমে ঢুলুঢুলু। শুধু পিকু একলাটি জেগে আছে। তার সামনে ভয়ংকর সেই লোকটা। বুড়োটা আস্তে আস্তে তার কোট খুলে দাঁড়ালো। পিকু

দেখলো লোকটার বুকের কাছ থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। লাল রক্তের ফোয়ারা যেন।

চীৎকার করে উঠতে চাইছিল পিকু। তার আগেই বুড়োটার কোটরে বসে যাওয়া চোখদুটো ধকধকিয়ে উঠলো।

"আমি, আমি গাঙচিলের মাংস পুড়িয়ে খেয়েছি। গাঙচিল খেলে কোন মানুষই টিকতে পারে না। বুক তার জ্বলে যায়। গলা তার জ্বলে যায়। চোখের সামনে থেকে সব রঙ পুড়ে যায়। আমি গাঙচিল খেয়েছিলাম বলেই তো, আমার এই দশা।" বলেই লোকটা দরজা খুলে বাইরের রাতের সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

চোখ বন্ধ করে চীৎকার করে উঠলো পিকু। ট্রেন তখনো চলছে সাঁই সাঁই করে। ধড়ফড় করে জেগে উঠলো কামরার বাকী লোকেরা।

"কি হয়েছে খোকা? কোন স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি?"

"পিকু, পিকু কি হয়েছে! কি হয়েছে সোনা?" পিকুর আব্বা ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

পিকু কিছুই না বুঝতে পেরে ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাতে লাগলো।

সামনের বেঞ্চির সেই ময়লা চাদর জড়ানো, আজগুবি ধরনের লোকটা, যে পাখি শিকারের গল্প বলেছিল সন্ধ্যেবেলায়, সে পিকুর আব্বার দিকে তাকিয়ে বললো, "দেখুন দিকি কি কাণ্ড, আপনার ছেলে আমাকে একটা গল্প বলতে বললো তো আমি তাকে নিকিবুড়োর গল্প শুনিয়ে দিলাম। এই দেখুন, নিকিবুড়োকে তো আপনারা আবার চিনবেন না। এ লাইনে যাদের যাতায়াত আছে, তারা চিনবেন। বুড়ো গাঙচিলের ডিমের ব্যবসা করতো। কাছিমের ডিম চালান দিতো আফ্রিকার কোন কোন হোটেলে। আশেপাশের নদীর চর থেকে সংগ্রহ করতো কাছিমের ডিম। একবার কি হলো ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো। কেউ কেউ বলে, বুড়োর মাথায় ছিট ছিল। তা আমি আপনার ছেলেকে সেই নিকি বুড়োর গল্প করছিলাম। সে যে তা শুনে এমন ভয় পাবে তা কে জানতো। আর আমি যদি তা জানতাম তাহলে কি আর তাকে এই গল্পটা শোনাতাম।"

পিকুর কাছে সবকিছু যেন কেমন ঘোরের মতো লাগছিলো। তার মাথায় পাতলা কুয়াশার মতো সবকিছু মিশে যাচ্ছে। কেমন যেন এলোমেলো মনে হচ্ছে সব কিছু। কখন যে সে ঐ লোকটার কাছে গল্প শুনতে চেয়েছিল, তা তার মনেই পড়ছে না। আর সেই বুড়োটা। যার বুকের ভেতর থেকে কেমন

গলগল করে রক্ত ছিটকে পড়লো। ট্রেনের দরোজা খুলে বাইরের কালো অন্ধকারের মাঝে ঝাঁপ দিলো যে। জাফরানের ক্ষেতের কথা বলছিল। সবই কি তাহলে মিথ্যে ! গাঙচিল পুড়িয়ে খাওয়ার গল্পটাও !

নদীর বুকে আলতো করে ভেসে বেড়ায় যেসব ধূসর বরণ গাঙচিল, তাদের ধরে কেউ যে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খেতে পারে, তা যে একদমই বিশ্বেস হয় না। না, পিকু আর কিছুই ভাবতে পারছে না, তার সব কিছুই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ট্রেনটা আস্তে আস্তে একটা ছোট্ট স্টেশনের কাছে থামলো। মৃদু হাওয়া বইছে। কয়েকজন ফেরীওয়ালা চীৎকার করতে করতে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে। "চা গ্রাম, চা গ্রাম" বলে সেই চেনা চীৎকার। যে কোন স্টেশনেই, রাতের যে কোন সময়েই গাড়ী থামুক না কেন, এই ডাকটা শুনতে পাওয়া যাবেই। কামরার বেশীর ভাগ লোকজনই পিকুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর খুব খারাপ লাগছিল।

"কিরে পিকু, ভয় পেয়েছিস?" ওর আব্বা বোতল থেকে ঠাণ্ডা পানি প্লাস্টিকের সবুজ গ্লাসে ঢেলে দিলেন।

"কিরে, কথা বলছিস না কেন?"

ব্যাপারটা আসলে পিকুও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ওর তো অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে। সব কথাগুলো যেন গলার ঠিক কাছটায় এসে জমে আছে। কোনমতেই মুখ দিয়ে আসছে না। সেই আজগুবি ধরনের লোকটা হঠাৎ টুপ করে নেমে গেল। পিকুর মনে হলো, লোকটা নামার আগে তার দিকে তাকিয়ে গেল। মানুষের ঐ রকম চাউনি সে আর দেখেনি ! কি ঠাণ্ডা সে চাউনি ! যেন বরফের দুটো ছুরি। সারা শরীর একেবারে অবশ করে দেয়ার মতো সে চাউনি।

ট্রেনটা মুদু ঝাঁকুনি দিয়ে আবার চলা শুরু করলো। ঘটাং ঘট, ঘটাং ঘট। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠলো পিকুর। ওর মনে হলো, পেটের ভেতরে একরাশ প্রজাপতি ফরফর করে উড়ছে। বেঞ্চির ওপর থেকে এক লাফ দিয়ে নেমে দেয়ালের দিকে ছুটতে চাইলো। তার আগেই মাথা ঘুরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। শুরু হলো বমি। পিকুর আব্বা অস্থির হয়ে উঠলেন। ছেলেটার হলো কি ! এমন করছে কেন !

"পিকু, কি হয়েছে বাবা তোর !"

ছেলেটাকে নিয়ে তিনি একলা চলেছেন তার নতুন জায়গায়। মা-মরা

ছেলেটাকে ছোটবেলা থেকে তিনিই মানুষ করছেন।

বমি করতে করতে পিকু বললো "আমার খুব খারাপ লাগছে, আব্বা।"

কামরায় একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি পিকুকে পরীক্ষা করে একটা ওষুধ খেতে দিলেন। ডাক্তারকে কেমন যেন একটু গম্ভীর দেখালো।

"হুম, ছেলেটাকে কোন বিষাক্ত জিনিস খাইয়ে অজ্ঞান করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এ নিশ্চয়ই কোন ছেলেধরার কাজ।'

ট্রেনের গতি তখন আরো বেড়েছে। কামরার সমস্ত লোক অবাক হয়ে ডাক্তারের কথা শুনলো। সেই আজগুবি ধরনের লোকটা। পিকুকে যে নিকি বুড়োর গল্প বলছিল। ঘুড়ির সুতোতে বড়শি গেঁথে পাখি ধরার গল্প বলছিল। আগের স্টেশনেই নেমে গেছে। লোকটার কাছে বেঢপ সাইজের একটা ঝোলাও ছিল। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের বুঝি ওটাতেই ভরে ফেলা হয়।

পিকুর আব্বার হঠাৎ মনে হলো, তিনি কুলকুল করে ঘামছেন। মাঝ রাতের এই ঘাটনা তাকে একেবারে হকচকিয়ে দিয়েছে। এই পিকুকে কতো আদর করে তিনি বড় করছেন। কি সরল চাউনি ছেলেটার। তাকে কিনা ছেলেধরাটা ঐ ঝোলার ভেতরে পুরে নিয়ে যে কোন স্টেশনেই টুপ করে নেমে যেত। আর কোনদিন দেখা হতো না তার পিকুর সাথে। উফ্, তিনি আর কিছু ভাবতেই পারছেন না।

পিকুকে বুকের কাছে টেনে নিলেন।

"এখন তোমার কেমন লাগছে পিকু?"

"ভালো লাগছে, আব্বা।"

ওষুধটা খাবার পর থেকে শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে পিকুর কাছে। জানলার বাইরে তাকালো। রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। গ্রামগুলো আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। এ সময়টাকে বলে ধলপহর। কাজলা পাখির বুকের বরণের মতো থাকে আকাশ।

ট্রেন ছোট্ট একটা ব্রীজ পেরিয়ে গেল। ব্রীজের কোণায় মাছের ডালি নামাচ্ছে নৌকা থেকে। শরীরটা একটু হালকা লাগছে পিকুর। একটা লেবুর টুকরো মুখে নিয়ে চুষছিলো। নতুন জায়গায় যাচ্ছে তারা। নাম কাঁকনপুর। আব্বা বলেছে ছোট্ট এক মফঃস্বল শহর। আব্বার সাথে কতো জায়গায় ঘুরে বেড়ানো হলো। জানালার কাছে মাথা রাখলো পিকু। ট্রেনের শব্দটাকে যেন মনে হচ্ছে "কাঁকনপুর, কাঁকনপুর।" কেমন হবে জায়গাটা? কামরার কোণায় এক বৃদ্ধ লোক সুরেলা গলায় কোরান শরীফ পড়ছেন। ট্রেনের গতি আস্তে আস্তে কমে

আসছে। আব্বা সবকিছু গোছগাছ করে ফেলেছেন এরি মাঝে। একটা জলা জায়গা থেকে কয়েকটা বক উড়ে গেল। আব্বা বললেন, "পিকু, আমরা কাঁকনপুর এসে গেছি।"

অন্যরকম পিকু

স্টেশন থেকেই দূরের পাহাড় দেখতে পেল পিকু। পাহাড়ে মাঝে মাঝে ধোঁয়ার মতো জমে আছে। আব্বা বললেন "মেঘ।" একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল স্টেশনের পাশের কড়ুই গাছটার নীচে। খুব নিরিবিলি স্টেশন এই কাঁকনপুর। কয়েকজন দেহাতী লোক নামলো। স্টেশন মাস্টার পিকুর আব্বাকে দেখেই ছুটে এলেন।

"আপনিই বুঝি স্যার এখানকার নতুন ফরেস্ট অফিসার। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ি আমি রেডী করে রেখেছি। ঘোড়ার গাড়ি, স্যার। কোন অসুবিধে হবে না। একদম আপনার বাংলো পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। এই রামধনিয়া, জলদি সাহেবের মালপত্তরগুলো গাড়িতে তুলে দে। আরে এই রামধনিয়া।"

স্টেশন মাস্টারটা একনাগাড়ে বকবক করে থামলো। উঃ, কথাও বলতে পারে বটে লোকটা। একবার বলা শুরু করলে সহজে যেন আর থামতে চায় না।

"স্যার, কি খাবেন বলুন। এই সকালে চা খেতে মন্দ লাগবে না। আরে এই বধুন, জলদি করে সাহেবকে চা দিয়ে যা। এই জংলী জায়গাতে এলেন স্যার শেষ পর্যন্ত, একটা মানুষ পর্যন্ত নেই, যার সাথে মন খুলে কথা কইতে পারি।"

পিকুর আব্বা এবার একটু হেসে বললেন, "বদলীর চাকরি। আসতেই হবে।"

"তা জায়গাটা কিন্তু খুব একটা মন্দ নয়, স্যার। প্রথম প্রথম অবিশ্যি একটু আধটু খারাপ লাগবে। তা অমন সবারই লাগে। তবে ভারী স্বাস্থ্যকর জায়গা এই কাঁকনপুর। খাবার দাবার সব একেবারে টাটকা। বাজারে গেলে চাই কি

কপাল ভালো থাকলে, বনমুরগীও পেয়ে যেতে পারেন। জংলীরা ধরে এনে বিক্রি করে। আমি তো আর কম জায়গায় ঘুরলাম না। কিন্তু এমন তোফা বনমুরগী আর কোথাও দেখিনি, খেতে কি টেস্ট।"

বুধন নামের লোকটা মাটির ভাড়ে করে চা নিয়ে এলো। স্টেশন মাস্টার তো তাই দেখে একেবারে হইচই করে উঠলেন।

"আরে উজবুক কোথাকার! সাহেবকে এইভাবে চা এনে দিলি! কেন, আমার ঘরে কি কাপ পিরিচ ছিল না। হারে বুধন, তোর আক্কেলখানা কবে হবে, বল দেখি?"

বুধন নামের লোকটা কেমন বোকাটেভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। পিকুর আব্বা সেই মাটির ভাড়টা হাতে নিয়ে বললেন, "আপনি মোটেই ব্যস্ত হবেন না। আমি এতেই খেতে পারবো।"

ঘন ধোঁয়া উঠছে গুড়ের চা থেকে। ভাড়ে করে খেলে তার স্বাদই অন্য রকম। পিকুর আব্বা চা খেতে খেতে চারদিকে তাকাচ্ছিলেন। পাখিরা কিচমিচ করে ডাকছে। "বাঃ, এখানে তো বিভিন্ন ধরনের গাছগাছালি রয়েছে!"

রামধনিয়া এসে জানালো, মাল তোলা হয়ে গেছে। গাড়ি রেডী। পিকুর খুব মজা লাগছিল, ঘোড়ার গাড়িতে উঠবে, এই কথাটা ভেবে।

রোদ আস্তে আস্তে বাড়ছে। দেহাতী লোকেরা মাটিতে বসে আয়েস করে চা খাচ্ছে। পিকুর হাত ধরে ওর আব্বা স্টেশনের বাইরে এলেন।

কয়েকটা ছোট দোকান। লোকজন খুব কম চোখে পড়ছে। একজন পাদ্রী সাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন। কয়েকটা রাজহাঁস সামনের ছাতিম গাছের নীচে জড়ো হয়ে কলকল করছে। ছোট্ট, নিরিবিলি স্টেশন কাঁকনপুর। ছোট্ট, সবুজ নিরিবিলি শহর কাঁকনপুর।

ঘোড়ার গাড়িটা টগবগিয়ে চলা শুরু করলো। লাল সুরকীর পথ। দু'পাশে ঝাউগাছের সারি। রাস্তাটা কেমন তাই ছায়া ছায়া হয়ে আছে। পিকু চারপাশের সবকিছু দেখছিলো। দেখার খুব নেশা পিকুর। যেখানেই গিয়েছে, দুচোখ ভরে দেখার চেষ্টা করেছে। কতো অজস্র টুকরো টুকরো ছবি চারপাশে। প্রতিদিন কতো নতুন ঘটনা ঘটছে। পিকু দেখে আর অবাক হয়। এই অবাক হওয়ার ধরনটা পিকুর একেবারেই আলাদা। আরো অনেকের সাথে আলাপ করে দেখেছে। পিকু যেটাতে অবাক হয়, অন্যেরা সেটাতে হয় না। পিকু যে ঘটনায় আলাদা একটা রহস্যের স্বাদ পায়, অন্যেরা তা যেন অনুভব করতে পারে না।

একবার সবুজ ঘাসে-ছাওয়া মাঠে অনেকগুলো লাল রঙের ফড়িং দেখেছিল

সে। ফড়িংগুলো জমাটভাবে এক জায়গায় বসেছিল। যখনই উড়ে যাচ্ছিল, তখন এক সাথেই উড়ে যাচ্ছিল। পিকুর কাছে পুরো ব্যাপারটাই খুব রহস্যময় লাগলো। একটুকরো লাল কার্পেট যেন সবুজ মাঠে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই রকম মনে হয়েছিল তার। আর এই অনুভূতির কথাটা ক্লাসের কয়েকজন বন্ধুর কাছে বলেছিল। পিকু এমনভাবে বলেছিল, যেন চোখের সামনে টকটকে লাল ফড়িং এর ঝাঁককে এক্ষুণি ভেসে যেতে দেখছে। তা এই ধরনের কথাকে মোটেই পাত্তা দেয়নি ক্লাসের বন্ধুরা। তাদের কাছে এটা যেন কোন ব্যাপারই নয়। অথচ এই দৃশ্যটা পিকুর মনে অনেকদিন গেঁথে ছিল। চোখ বন্ধ করেও দেখেছে সে লাল ফড়িং এর ঝাঁক। তখন পিকুর মনে হয়েছিল সে যেসব ঘটনা দেখেশুনে আলোড়িত হয় অন্য সবাই তা হয় না। যখন কাটিহারে থাকতো, তখন একটা লোক পিকুদের বাড়িতে বগড়ী পাখি বিক্রি করতে আসতো। ছোট ছোট বগড়ী পাখি খাঁচায় ভরে নিয়ে আসতো। শীতকালে কাটিহারের কাছে জলাভূমিতে অজস্র বগড়ী পাখি পাওয়া যেত। লোকটাকে মোটেই পছন্দ করতো না পিকু। কানে ঝোলানো মাকড়ি। একদিন পিকু বারান্দায় বসে ছবি আঁকছে এমন সময় বগড়ী পাখির খাঁচা নিয়ে সেই লোকটা এলো। খাঁচার ভেতর পাখিগুলো কেমন ছটফট করছে। খাঁচাটা এক কোণায় রেখে সামনের পান দোকানে গেল লোকটি। পিকুর তখন মনে হলো, বগড়ী পাখিগুলো যেন করুণ গলায় তাকে বলছে, "জলাভূমিতে আমাদের অন্য বন্ধুরা রয়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে ওদের সাথে মিলেমিশে খেলবো। আমাদের তুমি ছেড়ে দেবে ভাই।"

পিকু আস্তে আস্তে খাঁচার দরোজা খুলে দিল। আর অমনি বগড়ী পাখিগুলো ঝটপট করে বেরিয়ে এসে খোলা আকাশে মিলিয়ে গেল। পাখিওয়ালা লোকটা সবেমাত্র পান চিবুতে চিবুতে আসছিল। এই দৃশ্য দেখে হইচই করতে করতে ছুটে এলো চোখের সামনে এমন ধরনের সর্বনাশ যেন আর কখনো দেখেনি সে। পাখিগুলো ফরফর করে উড়ে গেল। হইচই শুনে পিকুর আব্বা বেরিয়ে এলেন। সব শুনে লোকটার হাতে একটা দশ টাকার নোট তুলে দিলেন। লোকটা তাতেই খুশি হয়ে গেল! যাবার আগে পিকুকে জিজ্ঞেস করলো, "খোকাবাবু, তুমি খাঁচা খুলে দিলেন কেন?"

লোকটার সেই প্রশ্নের কোন জবাব পিকু দিতে পারেনি। শুধু তার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল বগড়ী পাখিগুলোকে ছেড়ে দিতে। ওরা খোলা আকাশে মিশে যাক। কেন এই ইচ্ছেটা হয়েছিল, শুধু এই কথাটা কাউকে বলতে পারেনি। পিকুর মনে এমন কতো ইচ্ছে জাগে যেগুলো কাউকে বলতে পারে না।

কাঁকনপুরের লাল সুরকীর রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ির দুলুনীতে এসব ভাবছিল পিকু। নতুন জায়গায় এসে তার বুঝি আগের দিনগুলোর কথা খুব বেশি করে মনে পড়ছে।

নতুন বন্ধু

লাল রোদে ঝলমল করছে কাঁকনপুর। শহরে অজস্র সরল গাছের সারি। সারাটা পথে নানা ধরনের পাখিদের ডাক শুনতে পেল পিকু। পাখির কলকাকলিতে ভরা যেন কাঁকনপুর। লাল টালির ছাদ দেয়া একটা গীর্জা পেরিয়ে গেল। পাশে পুকুর। ঘোড়ার গাড়ি থেকেও দেখতে পেল পিকু, পুকুর ভর্তি টকটকে লাল শাপলা। খুব ছোট বেলায় কাটিহারে থাকতে একবার এক জমিদার বাড়ীর পুরনো দিঘিতে নেমেছিল পিকু। সেদিন ছিল বেজায় গরম। আকাশ ছিল তামাটে। সারাদিনই 'লু' হাওয়া বয়ে গেছে। গাছের সবুজ পাতাগুলো পর্যন্ত কালচে হয়ে গিয়েছিল। সারাটা দিনই মানুষগুলো হাসফাস করেছে। সেই রোদে ঝামা হয়ে যাওয়া গরমের একদিনে কাটিহারের জমিদার বাড়ির পুরনো দিঘিটায় নেমেছিল পিকু। চারপাশে একদম লোকজন নেই। দিঘি ভর্তি রক্ত শাপলা। কয়েকটা জলপিপি তির তির করে হেঁটে গেল পদ্মপাতার উপর দিয়ে। আলতো করে পদ্মপাতাগুলো কাঁপলো একটু। ভাঙা ঘাটলা। শ্যাওলার পুরু স্তর জমে আছে খাঁজে খাঁজে। পিকুর মনে হচ্ছিল দিঘির নীচে মাছগুলো ডাকছে। শ্যাওলা ঝাড়ের খাঁজে খাঁজে মাছদের বাসা! ডিমের মালা হয়তো থরে থরে সাজানো আছে সেখানে। মাছের পোনার ঝাঁক দিঘির এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ সিঁড়িতে পা পিছলে গেল পিকুর। হড়হড়িয়ে সে নেমে গেল দিঘির মাঝে। ভয়ে, আতঙ্কে চীৎকার করে উঠেছিল পিকু। এই দিঘিটা সম্পর্কে নানারকম গল্প শুনেছে সে। একটা কালো "দেও" নাকি থাকে দিঘির অতলে। পিকুর মনে হলো কে যেন তার পা ধরে টানছে। পায়ের আঙুলে সুড় সুড়ি দিচ্ছে। দিঘির পানি কি ঠাণ্ডা। শাপলার মাঝে হারিয়ে গিয়ে খাবি খেতে লাগলো পিকু। চোখে তখন লাল, নীল, সবুজ

হলুদের ঝিলিক। চারপাশে অজস্র লাল শাপলার ডগা। সেগুলোই মুঠি মুঠি করে ধরতে চাইছিল। শাপলা রেণুর এক রকমের মিষ্টি গন্ধ। এ সময় এই দিঘির কাছে কেউ আসে না। মোক্তার বাবু একটু আবার পাগলেটে ধরনের লোক। তার বেজায় শখ মাছধরার যতো পুরনো পুকুর হলো তার মাছধরার ঘাঁটি। সেদিন তিনি এসেছিলেন জমিদারের সেই পুরনো দিঘিটার কাছে। অনেকদিন থেকেই শুনে আসছেন একটা মস্ত কাল বাউশ মাছ নাকি আছে এই দিঘিতে। মাঝে মাঝে মাছটার বিশাল কালো পিঠকে দিঘির বুকে ভেসে থাকতে অনেকেই দেখেছে। সেই লোভেই এদিকে আসা। পুরনো বাউশ মাছের স্বাদ খুব চমৎকার হয়। পিকুর আর্ত চীৎকারটা মোক্তার বাবুর কানে গিয়েছিল। তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন লাল শাপলার বনে ছোট একটা ছেলে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাড়াতাড়ি দিঘিতে নেমে সাঁতরে গিয়ে তিনি তুলে আনলেন পিকুকে। আশ্চর্য এই ভরদুপরের এখানটায় কি করে এলো ছেলেটা! মোক্তার বাবু ততক্ষণে চিনতে পেরেছেন, চৌধুরী সাহেবের ছেলে।

"তুমি এখানে কেমন করে এলে? কি জন্যে এলে?"

"সরপুটির ঝাঁক দেখার জন্যে।" পিকুর সাফ উত্তর।

"সোনালি সরপুটি যখন দিঘির কিনারে ভেসে বেড়ায়, তখন আমার তা দেখতে ভালো লাগে। কতো রকমের মাছ থাকে দিঘিতে। আচ্ছা, মৌরলা আর খলসে মাছ আগের মত দেখি না কেন?"

ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন মোক্তার বাবু। ছেলেটা বলছে কি! মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে ছেলেটা মাছেদের খোঁজ খবর নিতে চাইছে। মোক্তার বাবু বুঝলেন চৌধুরী সাহেবের পিকু নামের এই ছেলেটা একটু অন্য রকমের। আশ্চর্য একটা অভিজ্ঞতা হলো মোক্তার বাবুর। মৃত্যুর কোন ভয়ই ছেলেটার চোখে মুখে দাগ ফেলতে পারেনি। দিঘির বুকে ভেসে বেড়ানো নানারকমের মাছ দেখার আনন্দে চকচক করছে তার চোখ।

এরপর পিকু যখুনি কোথাও লাল শাপলা দেখেছে, অমনি কাটিহারের সেই স্মৃতি মনে পড়ে গেছে সাঁৎ করে। তার নাকে এসে লেগেছে শাপলা রেণুর গন্ধ। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত এসে তাকে সিরিসিরিয়ে দিয়েছে।

খটখটিয়ে চলেছে ঘোড়ার গাড়ি। কাঁকনপুর জেগে উঠছে আস্তে আস্তে। কয়েকটা দোকানে রেডিও বাজছে। ঝাঁকা ভর্তি তরিতরকারী নিয়ে চলছে দেহাতী লোকরা। টাটকা আনাজপাতি দেখতে ভালো লাগে পিকুর। আসলে পিকুর কাছে ওর চারপাশের পৃথিবীর অনেক কিছুই ভালো লাগে। কাঁকুনপুরের

সাথে আস্তে আস্তে পরিচয় হচ্ছে পিকুর।

আব্বা বললেন, "তোমাকে এখানকার মিশন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব। ভালো স্কুল। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে।"

মিশন স্কুল! আবার নতুন করে শুরু হবে পিকুর টুলবেঞ্চের দিন। আব্বার সাথে এশহর ওশহর ঘুরে কম স্কুলের সাথে পরিচয় হলো না। এখনো মনে ভাসে শিউলীডাঙার সেই স্কুলটার কথা। পাশেই কুলকুল করে বয়ে গেছে শামুকভাঙ্গা নদী। স্কুলের গেটের সামনে বকুল গাছ। সবুজ মাঠের বুকে বকুল ফুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো। বুড়ো দপ্তরী ঘন্টা বাজাতো। ডং ডং ডং। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতো পিকু। অপরাজিতা ফুলের মতো নীল আকাশে পেঁজা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। শেষ শরতের ঝলমলে আবহাওয়া। এর মাঝে কি পাটিগণিতের হিসেব ভালো লাগে? ক্লাসরুমের আবছা অন্ধকারে জব্বার স্যার অঙ্ক বুঝিয়ে চলছেন একটানা। ব্ল্যাকবোর্ডে নানা জটিল হিসেবের আঁকিবুকি। পিকুর মন তখন নীল আকাশে উধাও। শিউলীডাঙার স্কুল মানেই বকুল ফুলের গন্ধ। শিউলীডাঙ্গার স্কুল মানেই লুকিয়ে লুকিয়ে গল্পের বই পড়া। কিসব লোমখাড়া হয়ে যাওয়া বই। "পেতনীদহের হীরে", "শ্মশান-কালীর জঙ্গলে।" সেইসব বই-এর পাতায় চারপাশের পৃথিবীটাকে ভুলে খুব সহজেই ডুব দিয়ে যাওয়া যায়। অনেক দূরের কোন দেশ তখন হাতছানি দিয়ে ডাকে। বড্ড রহস্যময় সেইসব দেশ। চোখের পলকেই নানা ধরনের আজগুলি ঘটনা ঘটে যায় সেখানে।

মনে আছে পিকুর "তিব্বত ফেরত তান্ত্রিক" পড়ার সময় অসিত স্যারের কাছে কানমলা খেয়েছিল। কেমন আছে শিউলীডাঙা স্কুলের বুড়ো দপ্তরী, অন্যসব বন্ধুরা। কেমন আছে হাশু। আম আটির ভেঁপু অপূর্ব বাজাতে পারতো। কেমন আছে সোনাই যে তাকে কয়েকটা হরিয়ালের বাচ্চা ধরে দিয়েছিল। পিকুর ভীষণ ইচ্ছে করে একদিন হুট করে সেই শিউলীডাঙার স্কুলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। জব্বার স্যার হয়তো বয়সের ভারে আরো ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটেন। ওকে দেখতে পেয়ে ঘষা কাঁচের চশমার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করবেন, "কেরে, পিকু না?"

এসব কথা ভাবতে ভাবতে কেমন কান্না পেয়ে যায় পিকুর। বুকের ভেতরটা টলটল করতে থাকে।

ঘোড়ার গাড়িটা একটা বাংলোর সামনে এসে থামলো। গেটের কাছে

মাধবীলতার ঝাড়। পিকুদের নতুন বাড়ি। একজন লোক বাড়ির ভেতর থেকে এসে দাঁড়ালো।

"আসুন স্যার, আপনার অপেক্ষাতেই আছি। শরীরটা একটু ম্যাজম্যাজ করছিল বলে স্টেশনে যেতে পারেনি। পথে কোন অসুবিধে হয়নিতো, স্যার।"

"আর বলবেন না শিকদার সাহেব, ট্রেনে রাতের বেলায়তো এক ডেঞ্জারাস ব্যাপার ঘটে গেল। আমার ছেলে পিকু পড়লো এক ছেলেধরার পাল্লায়। লোকটা পিকুকে কি সব খাইয়ে অজ্ঞান করে দেবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু সাকসেসফুল হয়নি। এ যাত্রা বড্ড বেঁচে গেছি।"

"এতো সাংঘাতিক কথা ! কই খোকা, এদিকে এসো তো।" শিকদার সাহেব পিকুকে কাছে টেনে নিয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। পিকু লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

"মংলি, মংলি কইরে, ব্যাটা জংলীটা যে কাজের সময় কোথায় যায়।"

কুচকুচে কালো একটা সাঁওতাল ছেলে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। আর এসেই ফিক করে হেসে বললো, "সেলাম সাব।"

"মংলি, জলদি করে সাহেবদের ঘরদোর খুলে দে। হাত মুখ ধোবার পানি দে। নাস্তার আয়োজন কর।"

মংলি হেসে সট করে চলে গেল। শিকদার সাহেব পিকুর আব্বার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সাঁওতালদের ছেলে। কাজে খুব পটু। ভালো ছেলে।"

কাঠের বারান্দা দিয়ে হাঁটতে মজা পাচ্ছে পিকু। ছোট কাঠের বাক্সে অর্কিডের ঝাড় ঝুলছে। পিকুর নিজের ঘরটা বেশ সুন্দর। জানালা দিয়ে পাহাড় চোখে পড়ে। বাঃ চমৎকার হবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাহাড় দেখা যাবে। আচ্ছা, ঐ পাহাড়ে হরিণ আছে নাকি। মংলিকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

খানিকবাদেই গরম গরম মুরগীর ডিম ভেজে নিয়ে এলো মংলি। সাথে জেলী মাখানো রুটি। কলা। না, ছেলেটা দেখছি কাজের আছে। ভীষণ খিদে পেয়ে গিয়েছিল পিকুর। পেটভরে খেল।

"এই তোর নাম মংলি। তুই একটা জংলী।"

শাদা দু'পাটি দাঁত দেখিয়ে হাসতে লাগলো মংলি।

"থাক থাক, অমন করে না বুঝে আর হাসতে হবে না।"

পিকুর আব্বা এর মাঝেই স্নান সেরে ফেলেছেন। এক্ষুণি তাকে অফিসে যেতে হবো। বেশী দূরে নয়। রাস্তাটা বাঁক নিতেই বন বিভাগের অফিস।

"পিকু বেশী বাইরে যাবে না। আমি অফিস থেকে এসে তোমাকে বেড়াতে

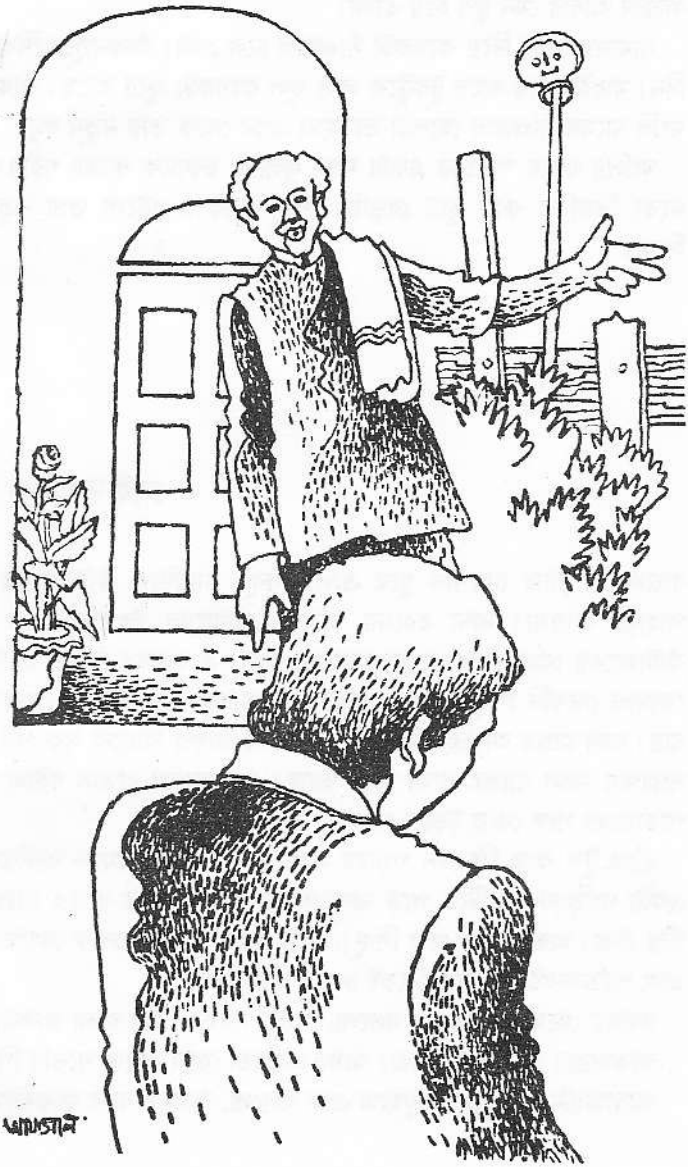

নিয়ে যাবে। মংলি রইলো তোমার কাছে। ও তোমার নতুন বন্ধু।"

আব্বা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে অফিসে চলে গেলেন। বিশাল বাংলো বাড়িটা আবার যেন চুপ হয়ে এলো।

সামনের রাস্তা দিয়ে কয়েকটা সাঁওতাল চলে গেল। কাঁকনপুরে পিকুর প্রথম দিন। মাধবীলতার ঝাড়ে টুকটুকে লাল ফুল কয়েকটা ফুটে আছে। কাঁকনপুরের মংলি নামের সাঁওতাল ছেলেটা তা'হেলে এখন থেকে তার নতুন বন্ধু।

মংলির গলায় পাথরের একটা মালা ঝুলছে। চকচকে কালো শরীর। পাখির মতো তিরতির করে ছুটে বেড়ায়। পিকু তাকিয়ে রইলো তার নতুন বন্ধুর দিকে।

সেই ভয়ানক চাউনি

বাংলো বাড়িটার চারপাশ ঘুরে এলো পিকু। চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া। পাহাড়ী জায়গা। নানা ধরনের জন্তু-জানোয়ারের উৎপাত হতে পারে। কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে মে ফ্লাওয়ারের ঝোপ। এ ধরনের ফুলের ঝোপ অন্য কোথাও দেখেনি পিকু। থোপা থোপা দুধশাদা ফুল ফুটে থাকে। চোখ জুড়িয়ে যায়। লাল রঙের কাঠের ফটক দিয়ে ঢুকলেই কাঁকর বিছানো সরু পথ। তাতে সারাক্ষণ সরল গাছের পাতা জমে থাকে। এলোমেলো বাতাস বইলে শুকনো পাতাগুলো পাক খেয়ে উড়তে থাকে।

হঠাৎ টুপ করে কি যেন পড়লো সরু পথটায়। পিকু চমকে তাকিয়ে দেখে একটা পাতিকাক মাটিতে পড়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে। কাকটার বুকের কাছে একটা তীর বেঁধা। অবাক হয়ে গেল পিকু। একটা জংলী ধরনের লোক কোত্থেকে ছুটে এসে পাতিকাকটাকে তুলে নিয়েই চম্পট দিল।

কলঘর থেকে দারোয়ানটা বললো, "ছোট সাহেব, ওরা হলো কাকমারা।"

কাকমারা ! সে আবার কারা। ওদের কথাতো কোন বইতে পড়েনি পিকু।

দারোয়ানটা হাত মুছতে মুছতে এসে বললো, "ওদের বলে কাকমারা। আর

কিচ্ছু শিকার করবে না। শুধু কাক মেরে মেরে খাবে। কি যে মজা পায় কাকের মাংস পুড়িয়ে খেতে।"

মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে উঠলো পিকুর। ট্রেনের একটানা দুলুনীর কথা মনে হলো। নিকি বুড়োর গল্পের কথা মনে হলো। বুড়ো কেমন যেন ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলেছিল, গাঙচিলের মাংস পুড়িয়ে খাবার কথা। পিকুর মনে হলো ওর চারপাশে অজস্র পাতিকাক আর গাঙচিল উড়ে চলেছে। কয়েকটা মানুষ শুকনো পাতায় দাউদাউ আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে গোল হয়ে নাচছে। আর সেই আগুনের ভেতরে ঝলসে নিচ্ছে পাতিকাকগুলো। তারপর মনের সুখে সেগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। পিকুর চারপাশে নিমেষের মাঝেই এমনি একটা ছমছমে রহস্যময় জগত তৈরী হয়ে গেল। পিকু আলাদা। অন্যদের চাইতে ভীষণ আলাদা। চোখ তার সব সময় টানটান হয়ে থাকে। যে চোখ চারপাশের পৃথিবী থেকেই নানা রহস্যময় জিনিস ছেঁকে নিতে পারে।

মংলি কোত্থেকে কয়েকটা হলুদ রঙের ফল নিয়ে এলো। খেতে চমৎকার। কাঁকনুপরকে ভালোবেসে ফেললো পিকু।

বিদঘুটে ধরনের শব্দ করে একটা মোটর গাড়ি থামে ফটকের পাশে। গলগল করে একরাশ ধোঁয়া বের হতে থাকে গাড়ীর পেছনের পাইপ থেকে।

দারোয়ানটা সেদিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, "এইরে ক্যানারি সাহেব এসেছে।"

ক্যানারি সাহেব? পিকু তাকায়। দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো এক বৃদ্ধ লোক। পায়ে শাদা কাপড়ের জুতো। শাদা ফুলপ্যান্ট। ফুল ফুল ছোপ দেয়া চমৎকার একটা বাটিকের শার্ট। মুখে পাইপ।

"শুনলাম নতুন ফরেস্ট অফিসার এসেছেন। ভাবলাম, আলাপটা করেই যাই। এই কাঁকনপুরে মন খুলে কথা বলবো, তেমন লোক নেই। কোথায় তিনি?"

"আব্বা তো অফিসে চলে গেছেন।"

'বাব্বা, প্রথম দিন এসেই অফিসে। বিশ্রাম টিশ্রামও নেননি। তুমি বুঝি তার ছেলে? আমার নাম ক্যানারি। ক্যানারি দ্বীপে অনেক বছর ছিলাম বলে এই নাম। সন্ধ্যেবেলায় আসবো। কালো কফি নিয়ে আসবো। তোমার আব্বাকে থাকতে বলো।"

ক্যানারি সাহেব তার বিদঘুটে গাড়িটা অনেক কষ্টে স্টার্ট দিয়ে রওয়ানা

দিলেন। সমস্ত কাঁকনপুরের লোক জেনে গেল, ক্যানারি সাহেব চলছেন।

"এই মংলি, চল না একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।"

মংলিতো খুশিতে ঝকমকিয়ে পিকুর সাথে চললো। দারোয়ান, মংলিকে সাবধান করে দিল, বেশি দূরে না যাওয়ার জন্যে। দুপুরের খাবারের আগেই যেন ফিরে আসে।

পাহাড়ী ঢালু রাস্তা। দু'পাশে ঝোপঝাড়। বড় বড় প্রজাপতি উড়ছে। এতো বড় আকারের প্রজাপতি এর আগে আর কোথাও দেখেনি পিকু। মংলির হাতে একটা লাঠি। মাঝে মাঝে তাই দিয়ে ঝোপঝাড় পিটিয়ে দিচ্ছে। রাস্তায় লোকজনের চলাচল বেশী নেই। এক কোণায় ছোট্ট একটা বাজার। কয়েকজন সাঁওতাল এক ঝাঁকা বনমুরগী নিয়ে বসে আছে। কাঁকনপুরের স্টেশন মাস্টার বলেছিল, এখানকার বনমুরগী খেতে নাকি খুব চমৎকার। পিকু দেখেছে, বেশী বয়সের লোকেরা সুযোগ পেলেই খাবারের কথা বলে। কিন্তু ওরা বেশী করে খেতে পারে না। পিকুর দাদু বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে নামলেই খিচুড়ী আর হাঁসের মাংস রান্না করতে তাগাদা দিতেন। পিকু একবার লুকিয়ে তার দাদুর একটা বাঁধানো খাতা পড়েছিল। সেখানে নানা দেশ–বিদেশের রান্নার কথা লেখা।

একটা পাহাড়ী ঝর্ণার কাছে এসে গেল মংলি আর পিকু। লোকজন একদম নেই। কি সুম সাম চারদিক। ঝর্ণার টলটলে পানির নীচে মাছের ঝাঁক ভেসে যাচ্ছে। মংলি খপ করে একটা মাছ ধরে ফেললো। পিকু চিনলো। ট্রাউট মাছ। মংলির হাতের ভেতরে খলবল করে উঠল মাছটা। মাছটাকে ধরে শুকনো বালিতে ছুঁড়ে ফেললো মংলি। যে মাছটা একটু আগেই রাজার মতো কলকল করে স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছিল, এখন সেটা মরে আছে। রোদ ঝলকাচ্ছে সেই মাছটার উপর। কয়েকটা নীল মাছি এসে বসলো তার উপর। দৃশ্যটা দেখতে খুব খারাপ লাগছিল পিকুর। একটা জীবন্ত তরতাজা প্রাণী চোখের পলকেই কেমন নিথর হয়ে গেল!

মংলি আর পিকু ঝর্ণাকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে চললো। পাশের গাছ থেকে কয়েকলটা লালমুখো বানর লাফিয়ে চলে গেল। পিকুর নাকে বুনো লতা পাতার একটা ঝাঁঝালো গন্ধ লাগলো। এই গন্ধটাই পিকুকে গাছগাছালির ভীড়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

রোদ এখানে আলতো করে আসে। পাতার ঠাসবুনোট ভেদ করে রোদ আসতে পারে না। মাটি তাই কেমন স্যাঁতস্যাতে। একটা ডাল থেকে গোটা তিন কাঠবেড়ালী চিরিক পিরিক করে অন্য ডালে লাফিয়ে চলে গেল।

পিকু যখন শিউলীডাঙায়, তখন একটা ছেলেকে কাঠবেড়ালী পুষতে দেখেছিল। ছেলেটার প্যান্টের পকেটেই থাকতো কাঠবেড়ালীটা। মাঝে মাঝে জুলজুল করে ইতিউতি তাকাতো। একবার হয়েছিল ভারী মজা। ভূগোলের রহমান স্যার টেবিলের উপর একটা গ্লোব রেখে ঘোরাতে ঘোরাতে বলতে লাগলেন "পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল।"

তখন পেছন থেকে কে যেন বলে উঠলো, "টাইটানিক জাহাজটা কেন ডুবেছিল, স্যার?"

"কেরে? কে এমন ইষ্টুপিটের মতো প্রশ্ন করে?" রহমান স্যার রীতিমতো তেড়ে ওঠেন।

সারা ক্লাস চুপ। রহমান স্যারের সন্দেহ, পেছনের বেঞ্চ থেকেই কেউ এই বিদঘুটে প্রশ্নটা করেছে। তিনি তার মোটা থলথলে শরীরটা নিয়ে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে পেছনের বেঞ্চির দিকে ছুটলেন। একটা ছেলেকে তার সন্দেহ হলো। যেই তাঁর কান টানতে যাবেন, অমনি সেই ছেলেটার প্যান্টের পকেট থেকে কাঠবেড়ালীটা চিরিক পিরিক করে উঠলো। রহমান স্যার চমকে লাফিয়ে উঠলেন। তার চশমাটি নাকের ডগায় ঝুলে রইলো। সারা ক্লাসে খিকখিক করে চাপা হাসি। ব্যাপারটা অবশ্য আর বেশী দূর গড়ায়নি।

"ছোট সাহেব, আপনাকে নিয়ে একদিন আমাদের গাঁওতে যাবো। যখন মহুয়া ফুল ফুটবে। আমরা যখন চাঁদনী রাতে মাদল বাজিয়ে নাচবো।"

পিকু মংলির পিঠে হাত রেখে বললো, 'নিশ্চয়ই যাবো। তোদের গাঁওতে নিয়ে গেলেই যাবো।"

কয়েকটা বনমুরগী ঝলমলে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল বনমুরগীগুলোর কি বাহার। রোদের মাঝে ওদের পালক যেন ঝলমল করে উঠলো।

"এই মংলি, এই রাস্তাটা আর কদ্দুর গেছে?"

"হুই ওদিকে। ভাঙা একটা বাড়ি আছে।"

ভাঙা বাড়ি। এই জঙ্গলের ভেতরে। অবাক হলো পিকু। হঠাৎ তার মনে হলো, সামনের ঝোপটা থেকে সাঁৎ করে কি যেন সরে গেল। কোন জন্তু নাকি! ঝোপটার কাছে যেতেই দেখলো একটা পোড়া সিগ্রেট পড়ে আছে। নিশ্চয়ই কোন মানুষ এখানে এতোক্ষণ বসে ছিল। কিন্তু এখানে বসে কি করছিল? এই ঘোর জঙ্গলে! পিকু আর মংলি না হয় জঙ্গল দেখতে এসেছে।

মংলি চেচিয়ে বললো, "হুই যে।"

এক দৌড়ে সামনের উঁচু জায়গাটায় উঠে এলো পিকু। একটা লোক ঢালু জায়গা দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে যাচ্ছে। মংলির চীৎকারে একবার ফিরে তাকালো লোকটা। আর তাকে দেখেই দারুণ চমকে উঠলো পিকু। এ যে ট্রেনের সেই লোকটা। আজগুবি গল্প বলে যে পিকুকে ঘাবড়ে দিয়েছিল। কাঁকনপুরের আগের স্টেশনেই টুপ করে নেমে গিয়েছিল যে। রেলের কামরার মৃদু আলোতে যে লোকটার চাউনি তার কাছে বরফের ছুরির মতো মনে হয়েছিল।

রহস্যময় অতিথি

পিকুর আব্বা অফিস থেকে ফিরেই পিকুকে দেখতে না পেয়ে ছটফট করছিলেন। কাউকে না বলে কয়ে গেল কোথায় ছেলেটা। দারোয়ান বলেছে, মংলি সাথে ছিল। টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছে বাবুর্চি। বনমুরগীর ঝোল রেঁধেছে। পিকুটা কোথায়? কাঠের ফটকটা ক্যাচ্ ক্যাচ্ করে উঠলো। এক হাঁটু ধূলো নিয়ে পিকু ঢুকেছে। পেছনে মংলি। মংলির হাতে কয়েকটা হলুদ নোফল।

"জলদি করে গোসল সেরে খেতে এসো। আমি তোমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।"

পিকু এক দৌড়ে কলঘরে চলে গেল। ইস! সারা গায়ে কি ধূলোবালিই না জমেছে। চন্দন সাবান মেখে অনেকক্ষণ শরীর রগড়ে গোসল করলো পিকু। শরীরটা কেমন ফুরফুরে হয়ে এলো। খাবার টেবিলে গিয়ে দেখে ওর আব্বা বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করছে, মাছ কেমন পাওয়া যায়।

"শীগগিরই তোমাকে মিশন স্কুলে ভর্তি করে দেব। আমাকে না বলে এদিক সেদিক হুট করে চলে যাবে না। তোমার তে আবার নানা রকমের খেয়াল চেপে বসে। মাথায়। নতুন বই-এর প্যাকেট এসে যাবে। মন ঢেলে বই পড়বে। আমার দূরবীনটা নিয়ে নিও। তোমার তো আবার পাখি দেখার বাতিক আছে। যখনি নতুন কোন পাখি দেখবে, তার বর্ণনা নোট বইতে যত্ন করে লিখে রাখবে। পাখিরা কেমন করে বাসা বানায়। কেমন করে বাচ্চাদের খাইয়ে খাইয়ে বড় করে, সবই তুমি দূরবীন দিয়ে দেখতে পাবে।"

খেতে খেতে পিকুর মনটা বেজায় খুশিতে ভরে গেল। আব্বার দূরবীনটা পাচ্ছে সে। দূরবীনটার প্রতি এতোদিন তার খুব লোভ ছিল।

বাবুর্চিটা ভালোই রান্না করে। এখানকার ভাতগুলো কি মিষ্টি আর যুঁই ফুলের মতো। ভাত খাবার পর এক গ্লাস দুধ এনে দিল। বটের আঠার মত দুধ।

খাবার পর নিজের বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লো পিকু। মংলি সারাটা ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে তকতকে করে রেখেছে। সুটকেস থেকে একটা সায়েন্স ফিকশান বের করে তার মাঝে ডুবে গেল পিকু। অন্য গ্রহের অধিবাসীরা কেমন করে পৃথিবী আক্রমণ করতে ছুটে আসছে, তারই ভয়ানক বর্ণনা। পড়তে পড়তে এক সময় ঘুমিয়ে গেল।

সন্ধ্যে বেলায় সেই বিদঘুটে শব্দের গাড়িটা নিয়ে ক্যানারি সাহেব এসে হাজির। কালো কফির একটা লম্বা টিন সাথে করে নিয়ে এসেছেন। বাগানে বেতের চেয়ারে বসে পিকুর আব্বার সাথে চমৎকার গল্প জুড়ে দিলেন ক্যানারী সাহেব। কাঁকনপুরে কোন ভদ্রলোক টিকতে পারে না। এখানে একটাও ভালো ক্লাব নেই। এইসব নানা টুকরো টুকরো কথাবার্তা। জাহাজে করে কতো দ্বীপ ঘুরেছেন। সেই সব গল্প। সবুজ পলিনেশীয় দ্বীপসমূহের গল্প। হাইতি, তাহিতি, পাগো পাগো। ক্যানারি সাহেব প্রথম আলাপেই তার জীবনের রকমারি তথ্য পিকু আর তার আব্বাকে জানিয়ে দিলেন। এক সময় তো পিকুর এমন মনে হলো, ক্যানারি সাহেবের জীবনে বোধ করি আর কোন নতুন তথ্য নেই। কিন্তু অনেক যাদুকর যেমন রঙীন কাগজের টুকরো চিবিয়ে মুখের ভেতর থেকে কি এক আশ্চর্য কৌশলে লাল নীল কাগজের শেকলের মালা টেনে বের করতেই থাকে, যেন আর শেষ হয় না, তেমনি ধরনের যেন ক্যানারি সাহেবের গল্পগুলো। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে চলে যাচ্ছেন। কিছু কিছু লোক আছে, তারা যখন বলে, তখন যেন মনে হয় কথার তুলি দিয়ে ছবি আঁকছে। মিঃ ক্যানারী হচ্ছেন সেই ধরনের লোক। যারা চোখের সামনে ছবির পর ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারেন। পিকু যেন তাহিতি দ্বীপটাকে কাঁকনপুরে তাদের বাংলো বাড়ির বাগানে আধো অন্ধকারে বসেও পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। তাহিতির নারকেল বনের চিরল পাতা সমুদ্রের বাতাসে কাঁপছে। মাছ ধরে ডিঙি নৌকারা সারি বেঁধে ফিরছে। নৌকা ভর্তি সবুজ ডাব।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে এইসব গল্প বলছিলেন মিঃ ক্যানারি। পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের ক্যাসেট নিয়ে এসেছিলেন।

সেগুলো বাজিয়ে শোনালেন। নিগ্রো মাঝিদের গান। কলার কাঁদি নিয়ে নৌকো চলেছে। নিগ্রো মাঝিদের নিজ নিজ দেশের কথা মনে পড়ছে। সেই পাতার ঝুপরী। সেই ফেলে আসা দেশ। নিগ্রো মাঝিদের গানগুলো এমন, যেন বুকের সবটুকু দরদ ঢেলে ওরা গায়। গানে যেন কান্না মিশে থাকে। একটা গানের কথাগুলো অনেকটা এই রকম, "আমার ফেলে আসা গ্রাম। সবুজ কলার গাছ। আমার ছোট্ট খামার বাড়ি। ফসল পেকে মউ মউ গন্ধ ছড়ায়, শুধু আমিই যেতে পারি না। আমার খামার বাড়ির আশে পাশে হয়তো অনেক বুনোঘাস গজিয়েছে। আগাছা বেড়েছে লক-লক করে। আহা, আমি যদি সেই ফেলে আসা গ্রামের বাড়িটিতে যেতে পারতাম, কলা ঝোপে বাতাস যেখানে থমকে থাকে।"

চাঁদের আলোতে বাগানটা কি অপরূপ হয়ে আছে! হাস্নুহানার তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। হাস্নুহানার গন্ধে নাকি সাপ আসে। ক্যানারি সাহেব অনেক গল্প করে উঠলেন।

"আমি মাঝে মাঝেই আসবো। বুঝলেন কিনা, এই কাঁকনপুরে গল্প করার মানুষ খুব কম। আমার কাছে দেশ-বিদেশের মেলা রেকর্ড রয়েছে। যখনই শুনতে ইচ্ছে হবে, আমাকে বলবেন। একদিন মেক্সিকোর পাহাড়ী এলাকার গান শোনাবো। অপূর্ব।"

আবার সেই গাড়ির বিকট শব্দ। পিকুর আব্বা বললেন, "মজার মানুষ।"

বাবুর্চি এসে জানালো, খাবার তৈরী।

দূরে একটা ট্রেন চলে যাওয়ার ঝকর ঝকর শব্দ শোনা গেল। ট্রেনের শব্দটা মিলিয়ে যেতেই হায়েনার চীৎকার শুনতে পেল পিকু। হঠাৎ সারাটা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো।

বুড়ো দারোয়ান বলে, "হায়েনারা হাসছে। বাঘ নামলে হায়েনারা ডাকে অমনি করে।"

মালি কাঠের ফটকটা বন্ধ করে দিয়েছে। রাতের খাবার খেয়ে সবাই যার যার ঘরে চলে গেল। পিকু টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে পড়তে বসলো। টেবিলের উপর বইগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। সবার উপরেই সেই বইটা। পিকু যেটা মনে মনে খুঁজছিল। এক বাতিঘরে রহস্যময় সামুদ্রিক জন্তুর আক্রমণ নিয়ে লেখা। গা ছমছম করা এই বইটা। কভারে সেই প্রাণীটার বিকট ছবি।

কাঁচের শার্সিতে বারান্দায় ঝোলানো অর্কিডের লতাপাতার ছায়া। পাহাড় এখন দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে ডুবে আছে। খুট খুট করে কি রকম একটা

শব্দ হচ্ছে। পিকুর মনে হলো, তাদের কাঠের ফটকটা কেউ খোলার চেষ্টা করছে। বইটা বন্ধ করে জানালার কাছে গেল পিকু। তাইতো, একটা লোক ফটক খুলে ঢুকছে। এতো রাতে কে ওই লোকটা? এদিক সেদিক তাকিয়ে বারান্দায় উঠে এলো সে।

পিকু চট করে পর্দার পাশে সরে গেল।

লোকটা জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। টেবিল ল্যাম্পের আলোতে দেখলো পিকু। ট্রেনের সেই লোকটা কাঁকনপুরের বুনো ঝোপে যাকে আজ দেখেছে। সেই অদ্ভুত, ঠাণ্ডা চাউনি।

পিকু চীৎকার করে উঠলো।

লোকটা পাঁচিল টপকে পালাচ্ছে।

আব্বা, শিকদার সাহেব ছুটে এলেন। দারোয়ান বাতি হাতে বেরিয়ে এলো।

পিকু বললো, চোর এসেছিল।

সবাই দেখলো কাঠের বারান্দায় পায়ের ছাপ। ফটক খোলা।

"তুমি আমার সাথে শোবে, এসো পিকু।"

"না আব্বু, আমার কিচ্ছু হবে না। আমি একলা থাকতে পারবো।"

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল পিকু, কে এই রহস্যময় লোক!

বাঘমুণ্ডীর পথে

ভোর থাকতেই মংলি এসে হাজির। কানে সে হলুদ পাখির পালক গুঁজেছে।

"ছোট সাহেব, আজ তোকে আমাদের গাঁয়ে নিয়ে যাবো। হুই পাহাড়ের কাছে। বাঘমুণ্ডী গাঁও।"

পিকু রাজী। মংলি খুব খুশি। কাঁকনপুরে সাঁওতালদের একটা বস্তি আছে। সেখানেই থাকে মংলিরা। সারাদিন ফুটফরমাশ খেটে সন্ধ্যেবেলায় চলে যায়। আজ তাদের গ্রামে উৎসব আছে। সাহেবের কাছে তাই ছুটি চাইতে এসেছে। পিকুকেও যেতে দিচ্ছেন ওর আব্বা।

শিকদার সাহেব একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'এদ্দুর যাবে আপনার ছেলে। পাহাড়ী পথ।"

"যাক না, পাহাড় জঙ্গল একটু ভালো করে চিনতে শিখুক। সাঁওতালদের গ্রামগুলোও দেখে আসুক। এতে অনেক অভিজ্ঞতা বাড়ে।"

পিকু তার ছোট্ট কিট ব্যাগে নানা রকম জিনিস গুছিয়ে নিয়েছে। দূরবীনটাও নিতেও ভোলেনি। একটু রোদ উঠতেই পাহাড়ী পথ ধরে রওয়ানা দিল তারা।

একটা লাল টালির বাড়ির সামনে দেখলো, সেই গাড়িটা দাড়ানো। ক্যানারি সাহেবের বাড়ি বোধহয় এটা। যা ভেবেছিল তাই। সাহেব একটা কুকুর সাথে নিয়ে বেরুচ্ছেন।

"কি ব্যাপার, ফরেষ্ট অফিসারের ছেলে না তুমি। কোথায় চল্লে হিচ হাইকারদের মতো।"

'বাঘমুণ্ডী।"

"বাঘমুণ্ডী ! সেখানে কেন?"

পিকুর মনে হলো, ক্যানারি সাহেব যেন নামটা শুনে একটু চমকে উঠলেন।

"মংলি আমাদের বাংলোতে কাজ করে। ওদের গ্রাম হলো বাঘমুণ্ডী। আজ নাকি সেখানে পর ব রয়েছে। সেটা দেখতেই যাচ্ছি।"

"কথা নেই, বার্তা নেই তোমার আব্বা তোমাকে হুট করে যেতে দিলেন। আশ্চর্য তো ! তুমি তো এখানকার পথ ঘাট কিছুই চেনো না।"

"মংলি সাথে রয়েছে যে।"

"কাল রাতে হায়েনার ডাক শোননি।"

পিকুর মনে হলো, ক্যানারি সাহেব তাকে যেন ভয় দেখাতে চাইছেন। তাকে যেন বাঘমুণ্ডীতে যেতে নিষেধ করছেন। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগলো না পিকুর কাছে। ওর আব্বা তাকে যেতে দিলেন। আর এই ক্যানারি সাহেবটা কিনা !

মংলি বললো "ছোট সাহেব, জলদি চলেন।" পিকু ক্যানারি সাহেবের কথার কোন উত্তর না দিয়ে চলা শুরু করলো।

মংলি ওদের ভাষায় একটা গান ধরেছে। এই পরবে কতো আনন্দ হবে। বছরে একবারই হয়। এই পরবেই ওদের গ্রামের সবচাইতে পুরনো গাছের কোটরে রাখা হয় সেই সোনার হাঁসের মূর্তি। তাকে ঘিরেই গোল হয়ে নাচবে ওরা।

পিকু সাঁওতালদের অনেক গল্প শুনছে। ওদের কারো কারো মতে, রোজ

রাতে আকাশে একটা মস্ত হাঁস এসে দুটো ডিম পেড়ে দিয়ে যায়। একটা হলো সোনার ডিম আর অপরটা হলো রূপোর ডিম। সোনার ডিম হলো সূর্য আর রূপোর ডিম হলো চাঁদ। নানা রকম পশুপাখি আর শক্তির পুজো করে সাঁওতালরা। কেউ পাহাড়, কেউ নদীর আবার কেউবা গাছ পাথরের। বাঘমুণ্ডীর সাঁওতালেরা করে সেই বিশাল হাঁসের পূজো। পরবের এই দিনে সোনার হাঁস জ্বলজ্বল করতে থাকে গাছের কোটরে। মশালের আলোতে নাকি চমৎকার দেখায়। মংলি এই সব গল্প শোনাচ্ছিল পথে যেতে যেতে। রাস্তায় আরো কয়েকজন সাঁওতালের সাথে ওদের দেখা হয়ে গেল। সবাই চলেছে বাঘমুণ্ডীর পথে। তারা মংলির সাথে পিকুকে দেখে একটু যেন অবাকই হয়ে গেল।

"এ কেরে মংলি?"

"আমাদের অফিসার বাবুর ছেলে। আমাদের গাঁওতে থাকবে। পরব দেখবে।"

মাথার ওপরে ঝকঝকে আকাশ। গাছের শাখায় শাখায় পাখিদের কলকাকলী। চমৎকার লাগছে পিকুর। পথ চলতে ওর খুব ভালো লাগে। অনেক কিছু দেখা যায়।

আব্বার সাথে কতো জায়গায় ঘুরছে। কাটিহারের লাল মাটির সড়ক। বিন্না ঘাসের বন বাতাসে সরসর করতো। একবার একটা কাল কেউটে বিন্নার ঝোপ থেকে ছুটে এসে তাকে তাড়া করেছিল। শিউলীডাঙার সেই শিশির ভেজা ঘাসের পথ। শীতের সকালে গাঁদা ফুল তুলতে যাওয়া। সুন্দর বনের সেই জলাভূমি। কাদাখোঁচার সাথে সাথে হোঁতাল বনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া।

একটা ঝর্ণার কাছে সাঁওতালদের দলটা এসে থামলো। সবারই বুঝি খিদে পেয়েছে। ঝর্ণার জলে রূপো রূপো মাছ তরতরিয়ে চলেছে।

মংলির কাছে একটা মোড়কে কয়েকটা বড়শি ছিল। গোটা কয় বড়শি বের করে মাছধরা সূতোয় বাঁধলো নিপুণভাবে। মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বেলে হাঁস চক্কর মারতে মারতে চলে গেল।

বড়শি ঝর্ণার বুক থেকে নেমে আসা খাড়িটাতে ফেলতে ঝটপট করে কয়েকটা মাছ ধরে ফেললো। পিকু দেখলো, অন্য সাঁওতালরাও মংলির মতোই মাছ পাচ্ছে। মাছগুলোকে ধারালো নুড়ি পাথর দিয়ে চিরে ফেলে ধুয়ে ফেললো। কয়েকজন সাঁওতাল মিলে রাশি রাশি শুকনো পাতা আর ডাল জোগাড় করে ফেললো। আগুন জ্বালিয়ে মাছগুলোকে তার ওপর সেঁকা। মিষ্টি ঝলসানে মাছ সেদ্ধর গন্ধ। খিদেতে পেট একেবারে চনমন করে ওঠে।

সবাই মিলে হুটোপুটি করে পোড়া মাছ খেল। পিকুর হঠাৎ মনে হলো, কাকমারার দলের কথা। ইস, কি করে যে পাতিকাক পুড়িয়ে খায়!। এতো ভালো ভালো পশুপাখি থাকতে। ওদের স্বভাবটাই কেমন বেয়াড়া গোছের।

পাহাড়ী রাস্তাটার ওপর দিয়ে একটা সজারু কাঁটা ঝমঝম করতে করতে ছুটে পালালো। সজারুটাকে দেখেই সাঁওতালদের দলটা সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলো। সজারুর লাল, তেলতেলে মাংস সাঁওতালদের কাছে খুব প্রিয়। সজারু ধরার চমৎকার একটা বুদ্ধি রয়েছে। কলাগাছ কেটে সজারুর ওপর তাক করে ফেলতে পারলেই হলো। কাটাশুদ্ধ একদম গেঁথে যাবে। তখন সেটাকে আয়েস করে ধরো। পালিয়ে যাবে কোথায়?

পথের পাশেই কয়েকটা কলাগাছ। একটা সাঁওতাল লাফাতে লাফাতে গিয়ে কলাগাছটাকে মাটি থেকে উপড়ে তুলে নিয়ে এলো।

"ঐ যে, এই তো সজারুটা" কে যেন চেচিয়ে উঠলো।

কাঁটা ঝমঝম করতে করতে এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সজারুটা তার আগেই কলাগাছটা উড়ে গিয়ে তাকে গেঁথে ফেললো। দারুণ, চমৎকার একটা দৃশ্য।

সাঁওতালেরা হইহই করতে করতে সজারুটাকে ধরে ফেললো। আনন্দে ওদের চোখ চকচক করছে। পরবের উৎসবটা জমবে ভালো।

সোনার হাঁস

বিকেল থাকতে বাঘমুণ্ডীতে পৌঁছে গেল দলটা। কি তকতকে আর ছিমছাম গ্রাম। সাঁওতালরা ভিড় করে দেখতে এলো পিকুকে। মংলির বুড়ীমা এক বাটি গরম দুধ এনে দিল।

সারাটা বাঘমুণ্ডী গ্রামেই উৎসবের গন্ধ। সোনার হাঁস রয়েছে সর্দারের কাছে লুকানো। সারা বছর কেউ সেই হাঁসটার খোঁজ পায় না। সর্দার তাকে কোথায় আগলে রাখে। পরবের এই দিনে গ্রামের সবচাইতে পুরনো গাছের কোটরে

রাখা হয় এই হাঁস।

বিকেল হতেই মাদল বাজছে। দ্রিম দ্রিম, দ্রিম দ্রিম। সমস্ত বাঘমুণ্ডীর সাঁওতালেরা এসে জড়ো হয়েছে সামনের বড় মাঠটায়। এক কোণায় সেই পুরানো শাল গাছটা। শাল গাছের শুকনো পাতা উত্তর দক্ষিণের এলোমেলো বাতাসে সর সর করে ঝরছে। বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে। মস্ত, গোল চাঁদ উঠে এলো আকাশে। মশাল জ্বলে উঠেছে এক এক করে। সাঁওতালেরা গান গাইছে ঘিরে ঘিরে।

বাঘমুণ্ডী গ্রামের সবচাইতে বেশি বয়সী সুচাঁদ বুড়ি এলো থুরথুরিয়ে। সাথে তার কুচকুচে কালো এক বেড়াল। বেড়ালটাকে দেখেই পিকুর শরীরটা কেমন ছমছম করে উঠলো। গল্পের বইতে ডাইনী বুড়িদের কথা অনেক পড়েছে। তাদের সাথে নাকি সব সময় এমনি ধরনের কালো বেড়াল থাকতো। সুচাঁদ বুড়িকে দেখে সেই সব গল্পের কথা মনে হলো পিকুর।

মংলি বসেছিল পিকুর পাশে। ফিসফিসিয়ে বললো, "বুড়ির কতো বয়স, কেউ তা বলতে পারে না। সবাই তাকে এ রকমই দেখে আসছে।"

বুড়ি ঠুকঠুকিয়ে এসে একটা গাছের গুড়িতে বসলো। পাশে সেই কুচকুচে বেড়ালটা।

মাদলের শব্দ ধীরে ধীরে বাড়ছে। শালের পাতা ঝর ঝর। সবার মাঝেই কেমন যেন একটা সাড়া পড়ে গেল।

মংলি বললো 'সর্দার আসছে।" সর্দারের হাতে সেই সোনার হাঁস। মশালের আলোতে জ্বলজ্বল করে উঠলো। সাঁওতালরা আনন্দে চীৎকার করে উঠলো। কোণার শাল গাছের কোটরে রাখা হলো সেই সোনার হাঁসটা।

এমনি সময় ঘটলো সেই ঘটনাটা। পরপর দু'বার গুলির শব্দ। সাঁওতালরা ভয়ে চীৎকার করে ছুটোছুটি করতে লাগলো।

পিকু দেখলো, কালো কাপড় জড়ানো দুটো লোক ছুটে এসে সেই শাল গাছটার কাছে গেল। কেউ কিছু বোঝার আগেই একজন সোনার হাঁসটা তুলে নিয়ে ছুটতে চাইলো।

পিকু দেখলো, সুচাঁদ বুড়ির কালো বেড়ালটা তড়াক করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই লোকটার উপর। নখ দিয়ে লোকটার সমস্ত শরীর আঁচড়ে কামড়ে দিচ্ছে।

পাশের লোকটা বন্দুকের নল দিয়ে জোরে একটা আঘাত করলো বেড়ালটাকে। সেই আঘাতে বেড়ালটা ছিটকে গেল। লোক দুটো সোনার হাঁস নিয়ে পালিয়ে গেল শালের জংগলের ভেতরে। গহীন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল

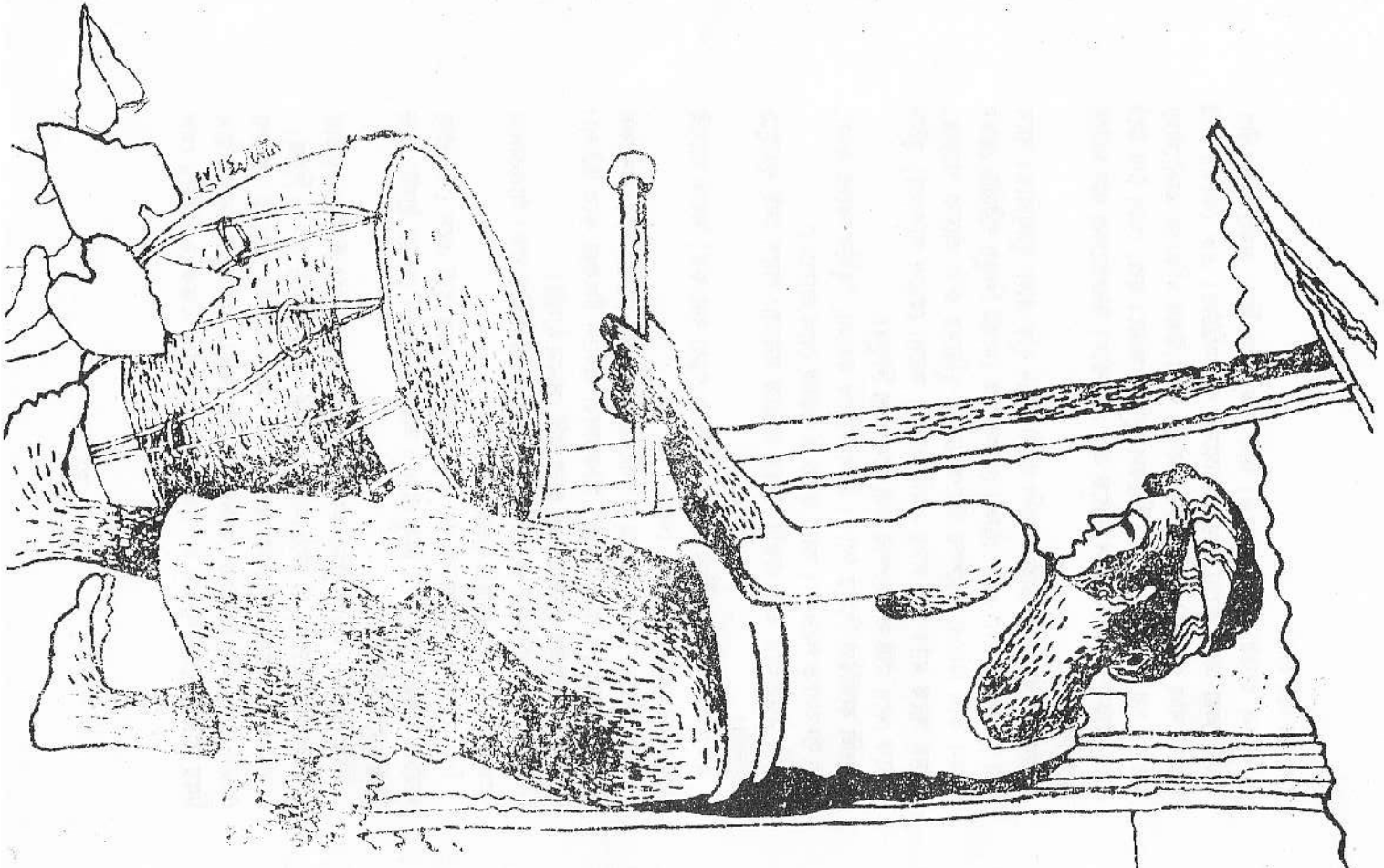

তারা।

পুরো ব্যাপারটাই কেমন ভোজবাজির মত সকলের চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেল।

সর্দার আর্ত চীৎকার করে উঠলেন। এই সোনার হাঁসকে কতো কষ্টে আগলে রাখা হয়। দেবতা এমন করে চুরি গেল। এ যে বড্ড অমঙ্গলের কথা।

সবাই চুপ হয়ে আছে। একটা সুন্দর উৎসব চোখের সামনেই কেমন তছনছ হয়ে গেল। সুচাঁদ বুড়ি মরা বেড়ালটাকে বুকের কাছে জাপটে ধরে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। বন্দুকের নলের আঘাতে থেঁতলে গেছে বেড়ালটার মাথাটা।

পিকুর কাছে পুরো ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগছিল। এমন যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল।

সর্দার মাথা নিচু করে বসে আছেন। মশালের নিবু নিবু আলাতে পিকু দেখলো, সর্দারের চোখে পানি চিকচিক করছে। কয়েকটা রাতচরা পাখি শুধু একটানা করুণ সুরে ডেকে চললো।

ঘুমপাড়ানী গান

আবার সেই আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ। আবার গাছপালার গন্ধ। উড়ন্ত বনমোরগের পালকে রোদের ঝলকানি। বাঘমুণ্ডী থেকে কাঁকনপুর ফিরলো পিকু মন খারাপ করে। সেই সোনার হাঁস চুরির ঘটনাটিকে মন থেকে কোন মতেই মুছে ফেলতে পারছে না।

সন্ধ্যে বেলায় পিকু তার আব্বার সাথে হাঁটতে গেল। ছোট্ট জায়গা কাঁকনপুর। কোথায় বা যাওয়া যায়। হাঁটতে হাঁটতে ক্যানারি সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি চলে এলো তারা। লোহার মস্ত একটা গেট। একজন লোক পাহারা দিচ্ছে।

"সাহেব আছে নাকি?"

" না নেই। সাহেব কারো সাথে দেখা করেন না।" লোকটার নির্লিপ্ত উত্তর।

লোকটা ভারি অভদ্র তো। এমন সময় বারান্দায় দেখা গেল ক্যানারি সাহেবকে।

"আরে, চৌধুরী সাহেব যে, আসুন আসুন। আপনি এদিকে। আরে পিকুও সাথে আছে দেখছি।"

সাহেব নিজ হাতেই গেট খুলে দিলেন।

" এদিকে হাঁটতে এসেছিলাম। ভাবলাম, আপনার সাথে দেখা করেই যাই।"

"ভালোই হলো। আজ আপনাদের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর ঘুমপাড়ানী গান শোনাব। চমৎকার একটা লংপ্লেইং রেকর্ড আছে আমার কাছে। আমি তো হলপ করে বলতে পারি, আপনার ছেলের কাছে এই গানগুলো খুব ভালো লাগবে। যেসব ছেলেমেয়ে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে তাদের জন্যেই এসব গান।"

"আপনি কি করে জানলেন যে আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি।"

" ও আমি চোখ দেখলেই টের পেয়ে যাই।"

ছিমছাম একটা ঘর। মৃদু নীল আলো জ্বলছে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশের ঘুমপাড়ানী গানের রেকর্ড চালিয়ে দিলেন ক্যানারি সাহেব। মুহূর্তেই ঘরটা মায়াবী সুরের দোলায় ভেসে যেতে লাগলো। ঘরটা যেন জাহাজ হয়ে সুরের সুমদ্রে ভাসছে। পিকুর কানে সমুদ্রের ঢেউগুলো আছড়ে পড়লো।

গানের কথাগুলো কি সুন্দর ! ক্যানারি সাহেব বসেছেন পিকুর সামনাসামনি। গানের কথাগুলো তার ছবির মতো ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। "এটা নরওয়ের ফিয়র্ড ভরা অঞ্চলের ঘুমপাড়ানী গান। নরওয়ের মাছ ধরার হ্রদগুলোকে বলে ফিয়র্ড। অসংখ্য ফিয়র্ড আছে ওদেশে। ঘাসের বনে ছোট্ট কুটির। দুষ্টু ছেলে ঘুমোয় না। মা বল্লেন, সোনালী-রূপোলী মাছের রাজ্যিতে নিয়ে যাবো তোকে। ফিয়র্ডের অতলে রয়েছে সেই রাজ্যি। লতানো শ্যাওলার ঝাড়ে টাপুস টুপুস করে মাছের দল লাফালাফি করে। সেখানকার আলো অদ্ভুত রকমের। সূর্যের আলো গিয়ে সেখানে পৌঁছায় না। সেই অন্ধকার রাজ্যিতে আছে রাশি রাশি মণিমুক্তো। তারই আলোতে জ্বলজ্বলে সেই রাজ্যি। মাছ কুমারীরা ঝিনুকের নৌকো নিয়ে এদিক সেদিক ভেসে যায়। তুমি ঘুমোও খোকন সোনা। তোমাকে আমি ফিয়র্ডের অতলে সেই মাছ কুমারীদের দেশে নিয়ে যাবো।"

দূরের বনে কোথাও হায়েনা ডাকছে। সমস্ত কাঁকনপুর সন্ধ্যে হতেই ছমছমে হয়ে যায়। এমনিতেই শহরটা শান্ত আর নিরিবিলি। যেইনা ঝুপ করে সন্ধ্যে নামলো, অমনি এক ধরনের ছমছমে বাতাস বইতে থাকে সারাটা কাঁকনপুরের

ওপর দিয়ে। পিকু ভূগোলের বইতে পড়েছে, সাভানার দীর্ঘ ঘাসের বনে কিংবা প্যাম্পাসের তৃণাঞ্চলে মাঝে মাঝে এক রকমের অদ্ভুত বাতাস বয়ে যায়। সে বাতাসে মাঠচড়াই আর এমনি সব ছোট ছোট পাখিরা টপাটপ মরে যায়। সেই রহস্যময় বাতাসকে ছোট পাখির দল খুব ভয় পায়।

ক্যানারি সাহেব পিকুকে নরওয়ের গ্রামাঞ্চল ঘুরিয়ে আনলেন। পিকু যেন এতোক্ষণ অনেকটা আচ্ছন্নের মতো ছিল।

"তুন্দ্রা অঞ্চলের গান শোন এবার। যেখানে হিমেল বাতাসের সারাক্ষণ মাতামাতি। বলগা হরিণ স্লেজ টেনে নিয়ে যায়। দুষ্টু ছেলেরা না–ঘুমুলে মায়েরা গানে ওদের ভোলাতে থাকে।

ছেলেরা বলে, "মাগো, বড্ড শীত করছে।"

ঃ ঘুমোও বাছা, ঘুমোও। আমাদের শিকারিরা গেছেন সীল মারতে। রাশি রাশি সীল দেখা গেছে আমাদের উত্তর সাগরে। সেই সীলের চর্বি দিয়ে আলো জ্বলবে আমাদের ঘরে। সেই সীলের হাড় দিয়ে মাছধরার বড়শি বানাবো আর সেই সীলের চামড়া দিয়ে মাছধরার ইয়াক। খোকন সোনা, বলগা হরিণ টানা গাড়িতে উঠো না, ইয়াকে করে ভেসে যেও। দূরে অনেক দূরের দেশে ভেসে যেও। আমরা তোমাদের কোন বাধাই দেব না।

কে জানে, হয়তো দূরের দেশে চলে যেতে পারবে, এই লোভেই তুন্দ্রার ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে যায়। গানটার সুর ভারি মিষ্টি। পাইনের বনে মাগপাই পাখিদের শিসের মতো।

পিকুর মনে হলো, তারও বুঝি ঘুম পাচ্ছে। ক্যানারি সাহেব যেন তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে গল্পগুলো বলে তাকে সম্মোহিত করতে চাইছেন।

পিকুর আব্বা আচমকা বলে উঠলেন, "চলি, ক্যানারি সাহেব। আপনার গানের কালেকশান চমৎকার। মাঝে মাঝে আসবো।"

পিকু তার আব্বার সাথে হেঁটে আসছিল কাঠের বারান্দা দিয়ে। ক্যানারী সাহেবের কুকুরটা গর্জন করছে।

বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসার সময় জানালা দিয়ে একটা ঘরে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলো পিকু। একটা লোক বিছানায় শুয়ে আছে। তারা সারা শরীরে নখের আঁচড়ের দাগ। লোকটা টেবিল থেকে নিয়ে তুলোতে ওষুধ মাখাচ্ছে।

সাঁৎ করে পিকুর মনে হলো বাঘমুণ্ডীর সেই দৃশ্যটার কথা। কালো কাপড় জড়ানো একটা লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সুচাঁদ বুড়ির হিংস্র কালো কুচকুচে বেড়ালটা। থাবার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে চাইছে সেই

লোকটাকে। মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে উঠলো পিকুর।

ক্যানারি সাহেব নিজের হাতেই লোহার গেটটা খুলে দিলেন।

"ল্যাপল্যাণ্ডের লোকেরা হরিণের হাড় দিয়ে চমৎকার এক ধরনের বাঁশি বানাতে পারে। সেই বাঁসির সুরের রেকর্ড আছে আমার কাছে। ভীষণ দুষ্প্রাপ্য এগুলো। একদিন শোনাবো আপনাদের।"

ক্যানারি সাহেব হাসিমুখে একটানা কথা বলেই চলেছেন। পিকু একবার পেছন ফিরে তাকাতে চাইলো। জানালা দিয়ে সেই লোকটাকে আরেকবার দেখা যায় কিনা। ক্যানারি সাহেবের একটানা কথা বলে যাওয়ার জন্যে তা আর হলো না।

দু'জন সাঁওতাল মাদল বাজাতে বাজাতে চলে গেল। ওদের বস্তিতে বোধহয় কোন উৎসব আসছে। মংলি বলেছে, রোজ রাতেই নাকি মাদল বাজিয়ে নাচ হয়।

ক্যানারি সাহেবের বাসা থেকে বেরিয়ে পিুক একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। নখের দাগে আঁচড়ানো লোকটার শরীরের কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

কাঁকনপুরের আকাশে এখন অনেক তারা। সেই তারার আলোতে পথ চলা যায়। মল্লিক সাহেবের বাড়িটা নানা ফুলের গাছে ভরা। মিষ্টি গন্ধে এখানকার বাতাস ভরে আছে। পিকুদের বাংলোর ঠিক সামনাসামনিই মল্লিক সাহেবের বাসা। গেটে লেখা 'আমলকী হাউস।"

ও বাড়ির সামনে দিয়ে আসার সময় পিুকর কানে এলো পিয়ানোর টুং টাং শব্দ। মল্লিক সাহেবের ছোট মেয়ে বাজাচ্ছে। তাকে আরো কয়েকদিন পিয়ানো বাজাতে দেখছে পিুক। বব করা চুল। মিশন স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। পিকুর এক ক্লাস নীচে।

পিয়ানোর শব্দটা যেন হঠাৎ করে সুরের কয়েকটা পাখি হয়ে পিকুর চারপাশে উড়তে লাগলো। আলোর পাখি। নরোম পাখি। এসব পাখি শুধু বুকের ভেতরে মিশে থিরথির করে।

দারোয়ানটা পিকুদের দেখেই তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। মাধবীলতার ঝাড়ের লাল ফুলগুলোকে রাতের অন্ধকারে কেমন কালচে দেখাচ্ছে।

মল্লিক বাড়ির দিকে একবার পেছন ফিরে চাইলো পিকু। আলো জ্বলছে ঘরে। বব করা চুলের সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে জানলার পাশে। পিকুর মনে হলো, আবার যদি এখন পিয়ানো বাজতো। আবার যদি আলোর পাখিগুলো উড়তো।

সেই দৃশ্যটাকে কোনমতেই ভুলতে পারছে না পিকু। নখে আঁচড়ানো শরীর। সুচাঁদ বুড়ির কালো বেড়ালটা গরগর করতে করতে লাফিয়ে পড়ছে।

ক্যানারি সাহেবের বাসায় ও লোকটা কি করছে? স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর ঘুমপাড়ানী গান। ক্যানারি সাহেব কেমন পিসফিসিয়ে কথা বলেন। নাঃ সব কিছু যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে পিকুর মাথায়। সে আর এখন কিছু ভাবতে পারছে না। রাতে তার চমৎকার একটা ঘুম দরকার।

রাতের অভিযান

পাম গাছের ফাঁক দিয়ে গোল চাঁদ দেখা যাচ্ছে। পিকুর আব্বা এতোক্ষণ রেডিওর নব ঘুরিয়ে দূরের কোন স্টেশন ধরার চেষ্টা করছিলেন। পিকু রেলিং এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। মোটেই ঘুম আসছে না।

"এই পিকু, তোর দাদুর গল্প শুনবি নাকি?"

দেয়ালে একটা দাদুর ছবি ঝোলানো আছে। কেমন খয়েরী রঙ এর ডিমের মতো গোল ছবি। আগের দিনের বেশীর ভাগ মানুষেরই ছবি ঐ রকম। পিকু বুঝলো দাদুকে এখন খুব মনে পড়ছে আব্বার। মাঝে মাঝে নিজ থেকেই পিকুকে সামনে বসিয়ে দাদুর গল্প শোনান।

"বুঝলি পিকু, আমি তখন খুব ছোট।"

ছোটবেলায় ওর দাদু দেখতে কেমন ছিলেন, মনে মনে সেটা একবার ভাববার চেষ্টা করে পিকু।

"আমরা থাকি দিনাজপুরের বালিয়াডাঙ্গি শহরে। ওখান থেকে তরাই আর ডুয়ার্সের জঙ্গল খুব বেশী দূরে নয়। শীতকালে ভুটানীরা ঝুড়িভর্তি কমলা নিয়ে আসতো। কি টসটসে ছিল সেই কমলার কোয়াগুলো। কমলার চামড়া কুচি কুচি করে ছিঁড়ে রোদে শুকিয়ে রাখতাম। তোর দিদা সেগুলো পানের সাথে মিশিয়ে খেত।

একবার হলো কি, আব্বাকে কে এসে বললো, হাওরের কাছে নাকি সারস

পাখি দেখা গেছে। হাওর আমাদের বাড়ি থেকে বেশী দূরে না। আব্বার ছিল শিকারের নেশা। বন্দুক আর সাইকেল নিয়ে তখুনি তিনি ছুটলেন। বেশী দূর তাকে যেতে হলো না। নলখাগড়ার বড় ঝোপটার পাশেই দেখলেন দুটোসারস। আব্বাকে দেখেই পতপত ডানা মেলে উড়াল দিল সারস দুটো। আব্বা সাইকেল চালিয়ে ওদের পিছু পিছু ছুটলেন। একবার সুযোগ বুঝে গুলী চালালেন। গুলীটা গিয়ে বিঁধলো একটা সারসের বাম ডানায়। ডানাটা ভেঙে নেতিয়ে গেল। কি আশ্চর্য, সারসটা তখন এক ডানা দিয়েই খানিকটা কাত হয়ে উড়তে লাগলো। একবার ভাবো তো দৃশ্যটা। এমনি করে কদ্দুর উড়ে যাওয়া যায়। এক সময় মাঠের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লো সারসটা। আব্বার কি মনে হলো, অন্য সারসটাকে আর গুলী করলেন না। ডানা ভেঙে সারাসটা মাঠে নামতেই হই হই করতে করতে ছুটে এলো ছেলেমেয়ের দল। সারসটার বিশাল ডানা দুটোকে দু'দিক থেকে টেনে মাঠের বুকে হেঁচড়ে নিয়ে চললো। ভাঙ্গা ডানার কোণটা লাল রক্তে ভেসে গেছে। সারস পাখিটা প্রথমে তার ঠোঁট দিয়ে কামড়াতে গিয়েছিল ছেলেদের। এতে ছেলের দল আরো মজা পেয়ে গেল। সারসটার ঠোঁট দু'টো ফাঁক করে ধরে তাতে কিছু খড়নাড়া টেসে দিল। সারসটা তার ঘোলাটে চোখে কেমন অসহায়ের মতো চারদিকে তাকাতে লাগলো। ছেলের দল উল্লাসে চীৎকার করতে করতে সেই আহত সারসটাকে নিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটলো। সঙ্গী সারসটা তখনো মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে। আব্বা সাইকেলে ঠেস দিয়ে চুপচুপ শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন।"

পিকুর আব্বা গল্পটা শেষ করে একটা সিগ্রেট ধরালেন। রান্নাঘর থেকে ডালের ফোড়ন দেয়ার গন্ধ আসছে। শাদা যুঁই ফুলের মতো ভাত। ধোঁয়া উঠছে ডালের বাটি থেকে। বাবুর্চি এক ধরনের টক স্বাদের পাতা কুচি কুচি করে কেটে ডালে দিয়েছে। তাতে ডালের গন্ধ আরো চমৎকার হয়েছে। বাবুর্চিটা নাকি আগে আরাকানের জঙ্গলে বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজদের সাথে ছিল। তার ভেটকি মাছের ফ্রাই খেয়ে এক মেজর তো তাকে ইংল্যান্ডেই নিয়ে যেতে চেয়েছিল। পিকুর বেশ লাগে বাবুর্চিটার গল্প শুনতে। যুদ্ধের সেই দিনগুলির কথা বলতে বলতে আনমনা হয়ে যায় বুড়ো বাবুর্চি।

পিকু বিছানায় কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। মোটেই ঘুম আসছে না। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘুর-পাক খাচ্ছে। ক্যানারি সাহেবের বাড়িটা তার কাছে খুব রহস্যময় লেগেছে। নখে আঁচড়ানো লোকটা। সে বাড়িতে আরো রহস্য ঘিরে আছে বলে পিকুর ধারণা।

ও একটুতেই চট করে অনেক কিছু বুঝতে পারে। কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগেই পিকু কেমন করে যেন টের পেয়ে যায়। কোথাও কোন রহস্য থাকলেই সেটা তার মনকে টানতে থাকে। অশান্ত হয়ে থাকে তার মন।

ড্রয়ার খুলে ছুরি আর টর্চটা বের করে নিল। তারপর দরজাটা খুলে চুপিসারে বেরিয়ে এলো। কেউ কোথাও নেই। সবাই যার যার ঘরে ঘুমুচ্ছে। কলঘরের পেছনে দিয়ে বাইরে যাবার একটা রাস্তা আছে। পা টিপে টিপে কাঠের বারান্দাটা পেরিয়ে এলো পিকু। অর্কিডের ঝাড় দুলছে।

আস্তে আস্তে বাংলোর পেছনে এলো পিকু। কাঁকনপুর সুমসাম। পাশের ছাতিম গাছটা থেকে প্যাঁচা ডেকে উঠল বিশ্রি সুরে। প্যাঁচার ডাক এমন হঠাৎ শুনলে বুকে ধক করে এসে লাগে।

পিকু একটা ঢিল তুলে ছুঁড়ে মারলো ছাতিম গাছটার দিকে। কয়েকটা পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে গেল।

পিকু আস্তে আস্তে এগুতে লাগলো ক্যানারি সাহেবের বাড়ির দিকে।

রাতটা কি ঘন। খানিক হাঁটতেই কিসের সাথে যেন হোঁচট খেলে পিকু। টর্চটা জ্বলতেই চমকে উঠলো সে। একটা মানুষের বাচ্চার মাথার খুলি।

সেই নিকষ রাতে, কাঁকনপুরের নিঝুম এক মাঠের মাঝে পায়ের কাছে মানুষের মাথার খুলি রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পিকুর সমস্ত শরীরটা কাঁটা দিয়ে উঠলো। আর ঠিক সে সময় কোণার পাকুড় গাছটা থেকে কয়েকটা শকুনের বাচ্চা মানুষের ছোট ছেলের মত কাঁদতে লাগলো।

পিকু প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছুরির বাটটাকে শক্ত করে ধরলো। হাতির দাঁতের তৈরী বাঁট। তার ওপর আবার কারুকাজ করা। অন্ধকারটা এখনচোখের কাছে সয়ে আসছে। পিকু এগিয়ে চললো ক্যানারি সাহেবের বাড়ির দিকে।

বাড়িটার পেছনে পাঁচিল। পিকু একটা গাছের ডাল ধরে অনায়াসে উঠে গেল পাঁচিলটার ওপর। তারপরেই ঝুপ করে নেমে পড়লো নরোম মাটিতে। ক্যানারি সাহেবের কুকুরটা এখন দেখতে না পেলেই হয়।

আশ্চর্য, পিকুর কাছে এখন একটুও ভয় লাগছে না। এই একটা ব্যাপার দেখেছে পিকু। যখন খুব বিপদের বা কোন রহস্যময় ঘটনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তখন কোত্থেকে যেন অদ্ভুত এক ধরনের সাহস অনুভব করে সে!

বাড়িটার কোণার ঘরটায় আলো জ্বলছে। পা টিপে টিপে সেদিকে এগিয়ে গেল পিকু। ঘরের ভেতর থেকে কয়েকজন লোকের চাপা কথা বলার শব্দ

শোনা যাচ্ছে।

জানালার কাছে এগিয়ে গেল পিকু। আস্তে সরে এসে তাকালো ভেতরের দিকে। চারজন লোক বসে আছে। ক্যানারি সাহেব মাঝখানে। টেবিলের ওপর অনেকগলো বিচিত্র ধরনের মূর্তি। অবাক বিস্ময়ে সেগুলো দেখতে লাগলো পিকু। খুব প্রাচীন মনে হচ্ছে মূর্তিগুলো। মিউজিয়ামে এ ধরনের অনেক মূর্তি কাঁচের শো কেসে সাজিয়ে রাখতে দেখেছে সে।

হঠাৎ একটা মূর্তির ওপর চোখ থমকে গেল পিকুর। বাঘমুণ্ডী গ্রামের সেই সোনার হাঁসটা জ্বলজ্বল করছে। সাঁওতাল সর্দার যেটাকে সারা বছর আগলে রাখতেন। সেই সোনার হাঁসটা এখন ক্যানারি সাহেবের মেহগিনি কাঠের টেবিলে।

সাহেব যেন মূর্তিগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করছেন অন্য লোকগুলোর কাছে। আবছা কথাবার্তা শুনে পিকুর অন্ততঃ তাই মনে হলো।

হঠাৎ কালো ভেলভেটের পর্দাটা সরিয়ে যে লোকটা ঘরের মধ্যে ঢুকলো, তাকে দেখেই দারুণ রকমের চমকে উঠলো পিকু। ট্রেনের সেই লোকটা! নিকি বুড়োর গল্প বলেছিল যে, সেই অদ্ভুত চাউনি। বরফের ছুরির মতো।

লোকটার হাতে একটা লাল পাথরের তৈরী ড্রাগনের মূর্তি। আলো যেন ছিটকে আসছে মূর্তিটা থেকে। এতো চকচকে। খুব দামী পাথর হবে বোধহয়।

ক্যানারি সাহেবের উৎফুল্ল গলা শুনতে পেল পিকু। "আমাদের এবারের চালানটা বিরাট হবে।"

কুকুরটার চাপা ডাক শুনতে পেল পিকু। আস্তে করে গাছের একটা ডাল ধরে পাঁচিলে উঠে এলো সে। তারপরেই ক্ষিপ্রগতিতে নেমে গেল পাশের ঝোপ ঝাড়ের ভেতর। কি একটা প্রাণী যেন সরসরিয়ে চলে গেল পাশ থেকে।

দূরের বনে হায়েনা ডাকছে। বাঘ নেমেছে বোধহয়। কাঁকনপুরের এই খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে পিকুর কাছে এখন আর মোটেও ভয় লাগছে না। তার কাছে যেন বিরাট একটা রহস্যের জট খুলে গেছে। এখন সে পুরো ব্যাপারটাকেই এক এক করে মিলিয়ে নিতে পারছে। ঘোলা স্রোত স্বচ্ছ আর টলটলে হয়ে আসছে।

ক্যানারি সাহেব তাহলে মূর্তি পাচার করে। ছেলেধরার ব্যবসা চালায়?

লোকদের শোনায় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশের ঘুমপাড়ানী গান। ল্যাপল্যাণ্ডের হরিণের হাড়ের তৈরী বাঁশীর মায়াবী সুর, তাহিতি দ্বীপের মন উতল করা গান নিগ্রো মাঝিদের আর্তনাদ ভরা করুণ সুর।

মানুষ কতো বিচিত্র হয়। ভাবতে ভাবতে পিকু পা চালিয়ে এগুতে লাগলো তাদের বাংলোর দিকে। মল্লিকদের বাড়ীর সামনে এসে একবার শুনে মনে হলো, পিয়ানোর মিষ্টি টুং টাং এর কথা।

সোনালি দিন

কাঁকনপুর থানার বড় দারোগা পিকুর সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। ছেলেটাকে তার কাছে বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হলো। আশে-পাশের অনেকগলো সাঁওতাল গ্রাম থেকে নানা ধরনের পুরনো মূর্তি চুরি যাওয়ার খবর তিনি আগেও পেয়েছেন। সাঁওতালদের কাছে নানা দুষ্প্রাপ্য মূর্তি থাকে।

এর কিছু পরেই ক্যানারি সাহেবের বাড়িটি ঘিরে ফেলা হলো পুলিশ দিয়ে। প্রচুর মূর্তি পাওয়া গেল বিভিন্ন ঘর থেকে। সমস্ত কাঁকনপুরে যেন সাড়া পড়ে গেল। মূর্তি পাচারকারী এতো বড় দলের সন্ধান এর আগে আর পাওয়া যায়নি। শহর থেকে ট্রেনে করে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা এলেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হলো কাঁকনপুরের মূর্তি-রহস্যের কথা। পিকুর সাক্ষাৎকার আর ছবি ছাপা হলো কাগজে কাগজে। অল্প সময়েই খুব বিখ্যাত হয়ে উঠলো কাঁকনপুর মিশন স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র পিকু। পিকু অবশ্য নিজে বুঝতে পারছিল না, পুরো ব্যাপারটায় তার কৃতিত্ব কতোটুকু। সেই রাতের অভিযানটাই তাকে এমন বিখ্যাত করে ফেলেছে।

বাঘমুণ্ডী গ্রামের সাঁওতালদের সর্দার এসে সোনার হাঁসের মূর্তিটা নিয়ে গেছে। মংলি ভীষণ খুশি। পিকুকে মংলিই তাদের গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল। সাঁওতালরা এখন মংলিকে তাই খুব খাতির করে।

পিকুর আব্বাতো সব দেখে শুনে অবাক। অনেকেই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তার অমন শান্ত ছেলে পিকু যেন এমন একটা কাণ্ড করে বসরে, তা তিনি ভাবতেই পারেন নি।

মল্লিক সাহেব আগে মিলিটারী অফিসার ছিলেন। পিকুর কথা শুনে তাকে

নিমন্ত্রণ করলেন। মল্লিক সাহেবের লোক এসে জানিয়ে গেল দুপুর বেলায় মল্লিক সাহেব তার জন্য অপেক্ষা করবেন।

কি বিশাল বাড়ি মল্লিক সাহেবের। কাঁকনপুরে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন!

পিকুকে দেখেই বললেন "ব্রেভ ইয়াং ম্যান। তুমি আমাদের ছোট্ট কাঁকনপুরকে একেবারে বিখ্যাত করে দিলে হে! ক্যানারি সাহেব যে এমন মারাত্মক লোক, তা কে ভাবতে পেরেছিল? আমার অবশ্য লোকটাকে কখনো খুব পছন্দ হতো না।"

মল্লিক সাহেবের বব করা চুলের ছোট মেয়েটা অবাক হয়ে সব কথা শুনছিল।

"বাপি, লোকটার কাছে অনেক রেকর্ড ছিল। আমাকে একদিন বলেছিল চার্চ মিউজিক শোনাবে। জার্মানীর বাখ নাকি অনেকগুলো চার্চ সঙ্গীত তৈরী করে গেছেন। সেগুলো শুনলে নাকি মন পবিত্র হয়ে যায়। সুন্দর হয়ে যায়। মন আর মলিন থাকে না।"

পিকুর দিকে তাকিয়ে বললো "সে রাতে আপনার যেতে একটুও ভয় করলো না!"

পিকু মাথা নীচু করে খেতে লাগলো।

"বুঝলে, দেশের শত্রু এরা। আমাদের কতো ঐতিহ্য আর সম্পদ এমনি করে বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে।" মল্লিক সাহেবের ভরাট কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো।

"বাপি, আমরা রোববার যে পিকনিকে যাবো, তাতে পিকুকে নিমন্ত্রণ করো না।" মল্লিক সাহেবের ছোট মেয়ের গলায় আবদার।

"অবশ্যই, অবশ্যই যাবে তুমি। রোববার ভোরবেলায় রেডী থেকো! আমরা যাওয়ার সময় তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে।"

চলে আসার সময় মল্লিক সাহেবের ছোট মেয়ে টুম্পা বললো, "তুমি পিয়ানো বাজাতে পারো?"

পিকু শুধু বললো, "না।"

"আমি পারি" টুমপার মুখে চাপা আনন্দ। এতক্ষণে যেন জব্দ করতে পেরেছে পিকুকে।

"শুনেছি। আমার খুব ভালো লাগে।"

কাঁকনপুরের আমলকী হাউসের আমগাছগুলোর পাতা কাঁপলো বাতাসে।

"রোববার, খুব ভোরে রেডী হয়ে থাকবে। তুমি আবার ঘুম কাতুরে

নাতো।"

"মোটেই না।"

"দেখা যাবে।"

রোববার খুব ভোরেই মল্লিক সাহেবের গাড়ি এসে হর্ন দিল। পিকু বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। নীল রঙের চমৎকার একটা গেঞ্জী পরেছে। পিকুকে খুব স্মার্ট লাগছিল।

মল্লিক সাহেব পিকুকে দেখেই বললেন, "গুড বয়। আমার পাশে এসো বসো।"

মল্লিক সাহেব নিজেই গাড়ী চালাচ্ছেন। অল্প কয়েকজন লোক প্রায় রবিবারেই পরিবারের লোকদের নিয়ে বনে পাহাড়ে চলে যান তিনি। ঝরঝরে একটা দিন কাটিয়ে আসেন।

গাড়ি চলেছে সাঁই সাঁই করে। টুমপার বব করা চুল বাতাসে উড়ছে।

একটা চমৎকার জায়গা দেখে গাড়িটা থামালেন মল্লিক সাহেব। ঝর ঝর করে একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে। দেবদারু গাছের সারি। সবাই গাড়ি থেকে হই হই করতে করতে নেমে এলো।

পলাশ ফুলের মতো রোদ তখন চারদিকে। সবাই মাঠে বসে ডিমের খোসা ভেঙে খেল। বাবুর্চি মগভর্তি চা দিয়ে গেল। খুব ভালো লাগছে পিকুর।

একটা সোনালি দিন কাটিয়ে আবার কাঁকনপুরের দিকে রওয়ানা দিল সবাই।

মুখের ছবি

পিকুর আব্বার আবার বদলীর চিঠি এসেছে। শান্ত, নিরিবিলি কাঁকনপুরের দিনগুলো আবার শেষ হয়ে গেলো।

শীতের এক সকালে মালপত্র গোছগাছ করে স্টেশনে চলে এলো পিকু তার আব্বার সাথে। বাংলো বাড়িটা ছেড়ে আসার সময় বুকের ভেতরটা কেমন টনটন করে উঠছিল পিকুর। এর মাধবীলতার ঝাড়, টকটুকে লাল ফুল, বেতস

ঝোপে ডাহুকের বাচ্চা, মাঠচড়াইদের হুটোহুটি, সরল গাছের নতুন পাতা, বারান্দায় ঝোলানো টবে অর্কিডের ঝাড়, সব কিছু ছেড়ে আসতে বেশ খারাপ লাগছিল তার।

কোথাও বেশী দিন থাকতে পারে না। আব্বার সাথে বুনোহাঁসের মতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শুধু ভেসে যায়। কোথাও যেন মায়া জমতে পারে না। এইভালো ভেসে ভেসে চলা। কতো লোকের সাথে পরিচয় হয়। কতো নতুন মুখ। কত গল্প। কত কাহিনী।

কাঁকনপুরের স্টেশন মাস্টার তাদের দেখেই চিনতে পারলেন।

"চলে যাচ্ছেন বুঝি, স্যার। আমারও বদলীর অর্ডার হয়ে এলো বলে।"

শীত-সকালের কুয়াশা ফিকে হয়ে আসছে। ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা বেজে উঠলো। জানালা দিয়ে দেখলো পিকু, কাঁকনপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে মংলি।

"মংলি" পিকু চীৎকার করে উঠলো।

ট্রেন তখন আস্তে আস্তে চলা শুরু করেছে। মংলি ছুটে আসছে। পিকুর মনে হলো, মংলির মুখটা যেন মিলিয়ে গেল, সেখানে ভাসছে কাটিহারের অজয় এর মুখ। অজয় তাকে রোজ সকালে নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে যেত। পিকু দেখলো, অজয়ের মুখটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শিউলীডাঙ্গার হাশুকে সে দেখতে পাচ্ছে। গাছের ওপর তরতরিয়ে উঠে শালিকের নরোম বাচ্চা পেড়ে দিত যে। যেন বলছে, "পিকু, মধুখালির মাঠে যাবি ?"

পিকু যেন দেখতে পেল, সুন্দরবনের সিধু বাওয়ালীর ছেলে তাকে নিয়ে যাচ্ছে হোঁতাল ঝোপের কাছে ; সেখানে একটা বাঘে খাওয়া হরিণের শরীরের কিছু অংশ পড়ে আছে।

পিকু যেন দেখলো, টুমপা পিয়ানো বাজাচ্ছে টুং টাং করে। মংলি হলুদ পাখির পালক হাতে নিয়ে বাংলোর সিঁড়িতে মুখ কালো করে বসে আছে।

চোখে জল এসে গেল পিকুর। ট্রেন তখন সাঁই সাঁই করে ছুটে চলেছে। কু ঝিক ঝিক। কু ঝিক ঝিক। .....

" সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করুন "

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)
পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির পুরস্কারের জন্য মুদ্রিত
বিক্রির জন্য নয়